২৪ জুলাই ১৯৮৫ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

নতুন
দুধযুক্ত
ফ্যারেক্স
শক্ত আহার
বেশী
সুস্বাদু
বেশী
সম্পূর্ণ
দুধ মেশানোই থাকে
Glaxo
New
Farex
CEREAL WITH MILK
মায়ের মত মমতায় ভরা
প্রত্যেকটি চামচ
আপনার বাড়ন্ত শিশুর শরীর
বৃদ্ধির জন্য একান্ত উপকারী।
দুধযুক্ত ফ্যারেক্স শক্ত আহার।
এটি মেশানো একদম সোজা। এটি খাওয়ানো
একেবারে সহজ। প্রোটিনে ভরপুর বলেই
শিশুর বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত দরকারী।
বাড়তি আয়রন রক্তকে সুস্থ রাখবার জন্য।
সঠিক অনুপাতে ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাস দাঁত
ও হাড় আরো মজবুত করবার জন্য।
শিশুর কোমল হজমশক্তির উপযোগী করে
আগেই রান্না করে রাখা হয়েছে।
দুধযুক্ত ফ্যারেক্স শক্ত আহার।
আরো সম্পূর্ণ শক্ত আহার।
স্বাস্থ্যের উৎস—গ্ল্যাক্সো
CLARION/B/GX/4/244 BEN
বিনামূল্যে! শিশুর প্রথম বছরের খাতার জন্যে, পোস্টেজ ও অন্যান্য খরচ বাবদ ১ টাকার স্ট্যাম্পসমেত লিখুন ঃ
পোঃ বঃ নং 19119 বোম্বাই (FCM-3) 400 025

আনন্দমেলা

৮ শ্রাবণ ১৩৯২ ■ ২৪ জুলাই ১৯৮৫ ■ ১১ বর্ষ ৮ সংখ্যা

গল্প

ভূত ও হাঁড়িকাবাব । প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ৪
পিতুর ভোট দেওয়া । বাণী বসু ৯
মহাযোগী সম্মেলন ও ডমরুবাবা । প্রবীর ঘোষ ১২
পকেটমারের গল্প । অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ১৭
গ্রামের পাশে জঙ্গল । সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৫৪

সম্পূর্ণ উপন্যাস

এবার রেড্ডি রাজবাড়িতে । মীরা বালসুব্রমনিয়ন ৩৫

শার্লক হোমসের গল্প

বুড়ো আঙুলের কথা । সার আর্থার কোনান ডয়েল ৫১

ধারাবাহিক উপন্যাস

গোলমাল । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ২৫
শয়তানের চোখ । সমরেশ মজুমদার ২৭

বিজ্ঞানবিচিত্রা

এলাম আমি কোথা থেকে । সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৭
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ৭

ডাক্তারবাবু বলছেন

ভিজব কি ভিজব না । ডাঃ বিশ্বনাথ রায় ১৯

ছড়া

কাকেদের গরম মিটিং । সুরজিৎ ঘোষ ৮
কোন্ আক্কেলে । প্রভাকর মাঝি ৮

জীবনবিচিত্রা

হাতি, গণ্ডার, জিরাফ । সুজিতকুমার নাহা ৩১

লেখাপড়া

দাদুরি…অংস (অর্থ জানো) । দেব-সেনাপতি ২৪
বৃষ্টিতে ভেজা (সহজে ইংরেজি) । প্রসাদ ২৪

খেলাধুলো

হেডিংলেতে হারল অস্ট্রেলিয়া । অশোক রায় ৬১
উইকেটকিপারের বরাত । সুজয় সোম ৬৩
অ্যাশেজ-যুদ্ধের নায়করা । নৃপতি চৌধুরী ৬৪
বিশ্ব-ব্যাডমিণ্টনে হ্যান জিয়ান চ্যাম্পিয়ন । সম্রাট রায় ৬৫
কলম্বো যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল । রাজা গুপ্ত ৬৬

চিত্রকাহিনী ও কমিক্স

টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২২, টারজান ৩৪
সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬০

অন্যান্য আকর্ষণ

ধাঁধা ১৫, শব্দসন্ধান ১৫, মজার খেলা ১৬
হাসিখুশি ১৬, তোমাদের পাতা ৪৯
অঙ্কের ধাঁধা ৫৯

প্রচ্ছদ : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম তিন টাকা । বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

সব শিশুরই
এক সুর
গেঞ্জি পরুন
কোহিনুর

কোহিনুর নিটিং মিলস্
গেঞ্জি • জাঙ্গিয়া
প্রস্তুতকারক

বাংলাদেশে আইনসম্মতভাবে বিক্রির জন্য প্রতি জেলায় ডিস্ট্রিবিউটার আবশ্যক ।

যোগাযোগ কেন্দ্র :
কোহিনুর নিটিং মিলস্
১১৩ মনোহর দাস কাটরা, কলিকাতা-৭০০০০৭

"যারা এ-বাড়িতে আসে, নাম করতে নেই ..."

ভূত ও হাঁড়িকাবাব

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

ঠাকুরমা বললেন, "বেশি হুটোপুটি কোরো না। এই তো সবে জ্বর থেকে উঠেছ। মিটসেফে খাবার রেখে গেলাম। আজ ভাত খেয়ে কাজ নেই। সকালে দেখলাম চোখ ছলছল করছে, গা'ও গরম, স্নান করবে না।"

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "খাবার কী রাখলে? অসুখের খাবার নয় তো?"

"অসুখের খাবার হতে যাবে কেন? দুটো মাংসের চপ, আলুভাজা। খেয়েদেয়ে শুয়ে থাকবে। হরিমতি কিন্তু দুপুরে বাড়ি চলে যাবে, তার বোনপো এসেছে। বলে দিয়েছি যেন দেরি না করে, যাতায়াতে দেড় ক্রোশ পথ বৈ তো নয়। আমরা সন্ধের আগেই ফিরে আসব, পাহাড়ে শুনেছি নেকড়ে আছে।"

শুনে একটুও খুশি হলাম না। কলকাতায় খুব ম্যালেরিয়া জ্বর হচ্ছিল। আমারও হল। স্কুল থেকে এসে কাঁপতে কাঁপতে শুয়ে পড়লাম। তিন দিন পরে ছেড়ে গেল বটে, তবে আবার এল। খেয়েদেয়ে স্কুলে যেতে আরম্ভ করলুম, কিন্তু পনেরো দিন পরে আবার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল। তখন ডাক্তারবাবু বললেন, "একে কাছেপিঠে কোথাও নিয়ে যান, এখন শীত পড়তে আরম্ভ করেছে। ও পরীক্ষার কথা বলছে, ওখানেই লেখাপড়া করুক না। পরীক্ষার সময় নিয়ে আসবেন, আবার পরীক্ষার পরে নিয়ে যাবেন।"

ঠাকুরমা বললেন, "ওর বাবাকে বলে দেখি।"

বাবা আবার কী বলবেন। ঠাকুরমাকে শুধু বললেন, "তোমরা যা ভাল বুঝবে তাই করবে। যাক্ না, কয়েকদিন ঘুরে আসুক।"

তিন সপ্তাহ পরে একদিন বিকেলে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে পশ্চিমের ট্রেন ধরলাম আমি, ঠাকুরমা, মেজকাকা, ছোটপিসি, রান্নার লোক ভোলা আর অনেক বাক্স-প্যাঁটরা, হাঁড়ি, খুন্তি। প্যাসেঞ্জার ট্রেন, বেশি ভিড় নেই। যে জায়গায় গেলুম তার নাম বলব না। ছোটপিসি বলেছিল, যদি খারাপ কিছু বলো, তা হলে রেল কোম্পানি তোমায় কী করে দেখো।

তবে এটা বলা যেতে পারে জায়গাটা খুব সুন্দর। পাহাড়গুলো একটু দূরে, তবে চেষ্টা করলে কয়েকঘন্টার মধ্যে হেঁটে গিয়ে ফিরে আসা যায়। কাছাকাছি দুটো নদী। তখন অল্প জল তিরতির করে বইছে। খাবারের মধ্যে অঢেল মুরগি আর মুরগির ডিম। একটু দূরে মারোয়াড়ির দোকান থেকে চাল, ডাল, কেরোসিন তেল কিনে আনতে হত। সপ্তাহে একদিন হাট, মাইল-দেড়েক দূরে। সেখানে নানারকম ফল কিনতে পাওয়া যায়—পেঁপে, আতা—যাকে ওরা সীতাফল বলে, স্তূপ করে রাখা চিনাবাদাম, কখনও কখনও ছোট মাছও আসে। অসুবিধা অবশ্য বড় মাছের। মা এলে এ-রকম বালি-মেশানো ছোট মাছ কখনও খেতে রাজি হত না। ছোটপিসি মুখে গজগজ করছে ঠিকই, কিন্তু সবসময়েই তার মুখ চলছে। ছোট জায়গা, সন্ধের আগে কলকাতা থেকে ট্রেন আসে পশ্চিমে যাবে বলে। দু'তিন মিনিট দাঁড়ায়, কিন্তু তার মধ্যে অনেক মজার মজার জিনিস দেখা যায়। স্টেশনের পাশে একটা ছোট দোকানে একজন লোক ডালপুরি আর অল্প হিং দেওয়া আলুর দম করে। আমার সেখানে যাওয়া বারণ। তবে একদিন চেখে দেখেছিলাম, বেশ খেতে।

ঠাকুরমার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করতে করতে তিনটে গোরুরগাড়ি এল। তার মধ্যে একটায় আমাদের বাড়ির সবাই, অন্যটায় পাশের বাড়ির শৈলেনবাবুরা এবং তৃতীয়টায় বাসন-কোসন, আমাদের বাড়ির ভোলা আর পাশের

বাড়ির শিউচরণ চড়ে বসল। ঠাকুরমা গোরুরগাড়িতে উঠবার আগে দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন, "হরিমতিকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিবি। দুপুরে খেয়েদেয়ে বরং বইগুলো হাতে নিস্। বাইরে তো মালী রইল, তোর ভয় কী, আমরা তো সন্ধের আগেই ফিরে আসব।"

শুনে আমার আবার রাগ হল। যদি শিকার করতেই যাচ্ছ তা হলে অতগুলো চপ,' মাছের কালিয়া আর ফ্রায়েড রাইস ডেকচি ভরে নিয়ে যাওয়া কেন ? আগেকার রাজাদের মতো হরিণ শিকার করেই তো খাওয়া যেত। মুখে কিছু বললাম না। এমন সময় ছোটপিসিও জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল। আমি বললাম, "তোমার আবার কী উপদেশ !"

সে কিছু না বলে অল্প জিভ বার করে আমাকে ভেংচে দিল। তারপর ঠাকুরমার কাছে গিয়ে বসল। গাড়ি তিনটে হাতার বাইরে চলে গেল। আমি আরও কিছুক্ষণ বসে রইলাম, তারপর বাইরে রোদ্দুরে রাখা এক বালতি জল দিয়ে খুব স্নান করলাম। ঠাকুরমা স্নান করতে বারণ করেছিলেন এই মনে করে বেশি করে স্নান করলাম।

এগারোটা বাজতে না-বাজতেই হরিমতি এসে বলল, "তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও দাদাবাবু, আমার আবার বাড়িতে কাজ আছে।"

তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বারান্দায় যেখানে একফালি রোদ পড়েছে সেখানে খেতে বসলাম, মাংসের কথা তো আগেই বলেছি, আর মাছের কালিয়া, তার সঙ্গে একটু লেবুর আচার। অন্য আচার আমার আবার খাওয়া বারণ। মিটসেফের ভিতরে একটা বড় প্যানে কালকের রান্না হাঁড়িকাবাবের অনেকটা পড়ে ছিল, সেটাকেও নিয়ে নিলাম। মনে হল এটাকে গরম করে নিতে পারলে আরও ভাল হত, কিন্তু হরিমতিকে তো সেকথা আবার বলা চলে না। খাওয়া ভাল হলে আমার মন তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যায়। একটু রোদে বসে থাকতে থাকতে আমার ঘুম-ঘুম পেতে লাগল, বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। একটু পরে হরিমতির গলা শুনতে পেলাম, "দাদাবাবু, আমি যাচ্ছি, দরজাটা ভেজিয়ে গেলাম।"

আমি কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, তখন বেলা পড়ে আসছে, রোদ্দুরের রঙ একটু হলদে হয়ে আসছে। একটা মালগাড়ির এঞ্জিন চিৎকার করে স্টেশন ছেড়ে চলে গেল। এঞ্জিনের গলাটা একদম ভাঙা, মনে হল এঞ্জিনটার খুব তেষ্টা পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমারও জলতেষ্টা পেয়ে গেল। আমার মাথার কাছে একটা টুলের উপর জলের কলসি রাখা। সেই দিকে এগিয়ে গেলাম, কিন্তু সবটা আর যেতে হল না। বাগানের গেটে ক্যাঁচ করে শব্দ হল। ভাবলাম মালী এল বুঝি, কিন্তু মালী নয়। দেখলাম জলের কলসির পাশে আমার চেয়ে বয়সে একটু বড় একজন মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোন দিক দিয়ে এসেছে বুঝতে পারলাম না। বেশ ধবধবে রঙ, একটু নীলচে চোখ। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এ-রকম কি মানুষের হয় ! একবার মেঝের দিকে তাকালাম, কিন্তু তার পা নজরে এল না।

গল্প শুনেছিলাম, আমাদের বাড়ি থেকে উপরে পাহাড়ের গায়ে যে-বাড়িটা কী-রকম ভাঙা-ভাঙা হয়ে পড়ে আছে, দরজা-জানালা সব হাট করে খোলা, সেখানে কারা যেন রাত্তিরে আসা-যাওয়া করে। হরিমতি তাদের কথা বলতে চায় না। একবার শুধু বলেছিল, "জানো দাদাবাবু, সেই যে রাত্তিরে যারা এ-বাড়িতে আসে, নাম করতে নেই। তারা রাত্তিরে এসে খেয়েদেয়ে চলে যায়। ঘর ঝাঁট দিয়ে মুছে চলে যায়, একটুও নোংরা দেখতে পাইনি।"

আমি বললাম, "হরিমতি, তুমি যদি তাদের একজন হতে তা হলে আমার ঘরটা পরিষ্কার হত, ঘরের কোনায় ঝুল জমেছে কী-রকম দেখছ না।'

হরিমতি বলল, "রাম রাম, এ আবার কী কথা, ওসব বলতে নেই।" এই বলে আর দেরি না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমার বুক কেমন ঢিবঢিব করতে লাগল। এই মেয়েটি কি তাদের কেউ ? আগে তো একে কখনও দেখিনি। মেয়েটি বলল, "জল খাবে, খাও না। ওরকম দাঁড়িয়ে আছ কেন ?"

কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল ঢকঢক করে খেলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কে ? কোথা থেকে এলে ?"

সে বলল, "আমার নাম নীলা। আমি পাহাড়ের উপরে থাকি।"

ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছে। পাহাড়ের উপরের গল্প হরিমতি আমাকে অনেক বলেছে। কী-রকম ভয়-ভয় করছিল, তবু জিজ্ঞাসা করলাম, "এখানে এলে যে ?"

সে বলল, "এখান দিয়েই তো যাচ্ছিলাম একটু আগে, দেখলাম তুমি বিছানা থেকে উঠে এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ। আমার মনে হল বোধহয় অসুখ করেছে, একবার গিয়ে দেখে আসি। বাড়িতে তো কেউ নেই।"

আমি তাকে ভয় দেখাবার জন্য বললাম, "কেউ থাকবে না কেন ? মেজোকাকা, ছোটপিসি, ঠাকুরমা, ভোলা সবাই তো রয়েছে।" আর মেয়েটি যদি ডাকাতের কেউ হয় সেই সন্দেহে যোগ করে দিলাম, "আর একটা বন্দুক।"

মেয়েটি বলল, "কোন্ স্কুলে পড়ো যে এত বাজে কথা বলতে শিখেছ। আমি সব জানি, তোমাদের বাড়ির সব লোক গেছে পাহাড়ে শিকার করতে, পাশের বাড়ির লোকেরাও গেছে।

হরিমতি গ্রামে চলে গেছে। মালী তার খেতি ফসল দেখতে গেছে, তোমার ঠাকুরমাকে কিছু বলে যায়নি। কেমন, ঠিক কিনা ? শিকারে আজ কিছু পাবে না। ওখানে কেউ কিছু পায় না। তা ছাড়া ভুল পথে গিয়েছে। সঙ্গে খাবার নিয়েছে তো, তা নাহলে আজ দুপুরে আর খেতে হচ্ছে না।"

সব কথা শুনে আমার বুক আবার ঢিবঢিব করতে লাগল। এ-মেয়েটা এত সব জানল কী করে ! তবে কি হরিমতি যা বলে তা সত্যি ? মেয়েটি কথা বলতে বলতে আমার কাছে এসে দাঁড়াল, মনে হল, এই কি এর আসল চেহারা। হঠাৎ যদি এর চেহারা বদলে কান দুটো খুব বড় বড় হাতির কানের মতো, কালচে চুল সাদা, দাঁতগুলো বড় বড় আর লম্বায় আট-ন' ফুট হয়ে যায়, তা হলে তখন আমি কী করব ?

মেয়েটি বলল, "কী, চুপ করে আছ কেন, ভয় করছে ?"

আমার কী রকম মাথা ঘুরতে লাগল, আমি পড়ে গেলাম। শুনতে পেলাম মেয়েটি বলছে, "এ কী ! মূর্ছা যাবে নাকি আবার। তোমার মৃগী আছে ?"

হঠাৎ দেখি সে আমার মুখে কুঁজো থেকে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। তারপর কী হল আমি জানি না। আমি কি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম ?

একটু পরে তিনটে গোরুর গাড়ি লণ্ঠন দোলাতে দোলাতে বাড়িতে ঢুকল। ছোটপিসি চেঁচাতে চেঁচাতে গাড়ি থেকে নামল, "জানিস নানকু, আজ কিছু পাওয়া যায়নি। একটা পাখির পালকও নয়। ভাগ্যিস খাবারদাবার নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শৈলেনবাবুদের সঙ্গে তো খাবার ছিল না। ওঁরা বলেছিলেন ওঁরা পাকা শিকারি, যাহোক কিছু পাবেনই। শেষ পর্যন্ত হরিমতির রান্না খেয়েই ফিরতে হল।" ঘরে এসে বলল, "কী রে, তুই এ-রকম করে পড়ে আছিস কেন ?"

এমন সময় বাইরে থেকে ঠাকুরমার গলা শোনা গেল, "কী রে নীলা, তোরা কবে এলি কলকাতা থেকে ?"

মেয়েটি বলল, "সেকথা আর বোলো না। মালপত্র আজই এসে পৌঁছেছে ভোরের গাড়িতে। বাবাও এসেছেন। আমাকে বললেন, চল তোকে নিয়ে যাই, কলকাতায় থাকলে তো দুষ্টুমি করবি। সঙ্গে কলকাতা থেকে আনা লুচি আলুভাজা আছে। ভাবলাম, যাই, তোমাদের বাড়ি থেকে এবেলা খেয়ে আসি।"

ঠাকুরমা বললেন, "বেশ করেছিস। আমরা তো সমস্ত দিন বাইরে ছিলাম, বাড়িতে কিছু ডালপুরি আছে সকালবেলার, ঝাল-ঝাল হয়েছিল, তোর ভাল লাগবে। এক্ষুনি আলু আর টম্যাটো দিয়ে একটা তরকারি করে দিচ্ছি, তুই বোস্। ওই যাঃ, ভুলে গেছি, দেখ মিট্‌সেফে একটা প্যানে অনেকটা হাঁড়িকাবাব রাখা আছে, তুই হাত ধুয়ে নিয়ে নে।'

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরমা জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, পেয়েছিস তো ?"

নীলা বলল, "না দিদিমা, তবে প্যানটা পেয়েছি। বাটির গায়ে একটু লেগে আছে ঠিকই, তবে ভূতে বোধহয় চেটেপুটে সাবাড় করে দিয়েছে।"

ঠাকুরমা বললেন, "সে আবার কী ? আমি দেখছি দাঁড়া।"

আমার তখন মনে হল, এইবার আর-একবার মূর্ছা যাবার সময় হয়েছে।

ছবি : দেবাশিস দেব

একটি গোয়েন্দা গল্প

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

মেরুদণ্ডী প্রাণীরা অমেরুদণ্ডী প্রাণী থেকে এসেছে। তা না হয় হল। কিন্তু প্রশ্ন হল, কোন্ শিরদাঁড়াহীন প্রাণী থেকে? পোকামাকড়? না চিংড়ি? না জেলি মাছ? শিরদাঁড়াওয়ালা প্রাণীর পূর্বপুরুষ কি কেঁচো? না তারা-মাছ? কে তাদের পূর্বপুরুষ?

জীবতাত্ত্বিকেরা ইতিমধ্যে লক্ষ করেছিলেন, সমুদ্রের কাঁটাওয়ালা তারা-মাছ আর তার জাতভাইদের ভ্রূণ জন্ম নেবার প্রথম দিনে অনেকটা শিরদাঁড়াওয়ালা প্রাণীর ভ্রূণের মতোই বেড়ে ওঠে।

দুটির গঠনভঙ্গি এক। এই মিল প্রাণিরাজ্যে আর কোথাও দেখা যায় না।

বিজ্ঞানীদের হাতে ছিল এই একটিমাত্র সূত্র। কিন্তু তাই দিয়েই তাঁরা পাকা গোয়েন্দাদের মতন ধরে ফেলেছিলেন যে,

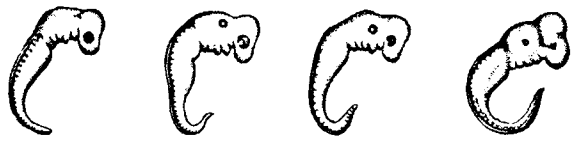

কোন্‌টা কোন্ প্রাণীর ভ্রূণ, প্রথম অবস্থায় তা বোঝা শক্ত। (বাঁ দিক থেকে) মাছ, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণী

কাঁটাওয়ালা আর শিরদাঁড়াওয়ালা প্রাণীরা পরস্পরের নিকটাত্মীয়।

তাঁরা যে তুখোড় গোয়েন্দা, তা বোঝা গেল যখন কিছুদিন পরে হাতেনাতে তাঁদের ধারণা প্রমাণ হয়ে গেল।

তারা-মাছ (শিরদাঁড়াওয়ালা প্রাণীর নিকটাত্মীয় এরাই?)

১৯৩২ সালে দুজন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করলেন যে, কেবলমাত্র শিরদাঁড়াওয়ালা আর শিরদাঁড়াহীন প্রাণীর মধ্যে একই রকমের কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ আছে।

১৯৪২ সালে নিখুঁতভাবে রক্ত পরীক্ষার পর এ-প্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হল। এই পরীক্ষায় জানা গেল, শিরদাঁড়াহীনদের মধ্যে কাঁটাওয়ালা তারা-মাছ আর তার জাতভাইরাই হল শিরদাঁড়াওয়ালা প্রাণীদের সবচেয়ে নিকটাত্মীয়।

রসায়ন, লুপ্তপ্রায় অভিজ্ঞান-অঙ্গ, হাড়ের গঠন বা অস্থিসংস্থান, সেইসঙ্গে আরও নানা ধরনের মিল—এ থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, আজ আমরা যত কিছু উদ্ভিদ আর যাবতীয় প্রাণী দেখি, ক্রমবিবর্তনের ধারায় তারা সবাই একই পূর্বপুরুষদের সন্তান।

কিন্তু সেই পূর্বপুরুষেরা গেল কোথায়?

আমরা কি কখনও তাদের দর্শন পেয়েছি?

জেনে নাও

তিন-পেয়ে টেবিল পড়ে যায় না কেন

চারপেয়ে যত ফার্নিচার, টেবিল, চেয়ার, টুল, সবই মেঝের উপরে ভালভাবে বসবে—এই আমাদের ধারণা। কিন্তু তিনপেয়ে কোনো কোনো ফার্নিচারও তো পাওয়া যায়। তিনপেয়ে টেবিল দেখি। এই তিনপেয়ে টেবিল মেঝেতে পড়ে যায় না কেন?

টেবিল, চেয়ার বা আর যাই হোক—এরা সব কিছুই তো আছে ঘরের মধ্যে মেঝের ওপরে। মেঝে মানেই তো একটা সমতল। এই যে সমতল, এই সমতলকে নির্দিষ্ট করার জন্যে চাই তিনটে বিন্দু, যেমন দুটো বিন্দুতে নির্দিষ্ট করা যায় একটা সরলরেখা, ঠিক সে-রকম।

টেবিলের তিনটে পায়া মেঝেতে এসে মিলেছে। মেঝের ওপরে এরা তিনটে বিন্দু যেন। আর এই তিনটে বিন্দুতে তৈরি তলের সঙ্গে মেঝের তল মিশে যাচ্ছে। সেই জন্যে তিনপেয়ে টেবিল মেঝেতে ভালভাবে বসে, ঢেঁকির মতো এদিক-ওদিক করে না।

তার মানে এই নয় যে, একটা চারপেয়ে টেবিলের একটা পায়া ভেঙে দিলে তা সুন্দরভাবে বসবে মেঝের ওপরে। পায়া-তিনটে এমনভাবে থাকবে যাতে টেবিলের ভর সামলাবার ক্ষমতা থাকে। তাহলে কি চারপেয়ে টেবিল মেঝের ওপরে ভালভাবে বসে না?

বসে যে, তা তো দেখাই যায়। কিন্তু সব সময়ে বসাটা ভালভাবে হয় না। দেখতে তো পাই, ঠিকমতো বসানোর জন্যে ভাঁজে-ভাঁজে কাগজ গুঁজে দিতে হয় কখনও-কখনও পায়ার নীচে।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

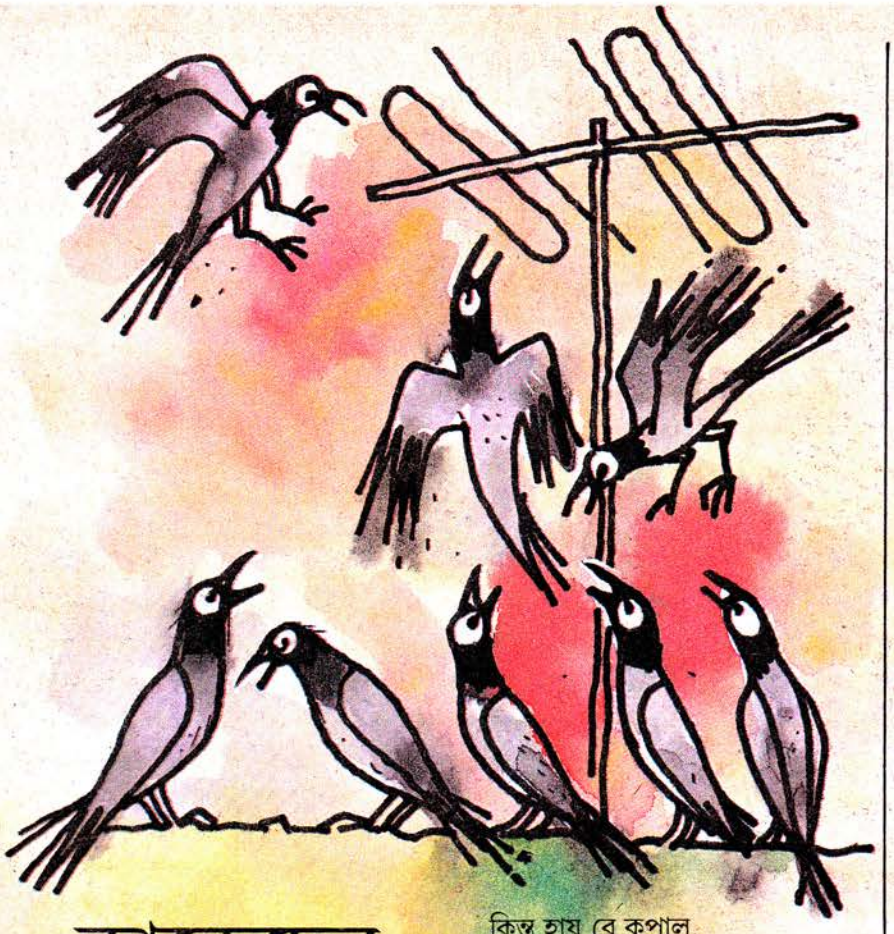

কাকেদের গরম মিটিং

সুরজিৎ ঘোষ

গতকাল ভোর পাঁচটায়,
পাঁচিলের ওই কাছটায়,
কাকেদের মিটিং ছিল ।
বহু আলোচনার পরে,
চাঁচাছোলা গলার জোরে
দোষী সাব্যস্ত হল ।
কারা, তাও বলতে হবে,
আমার আর দোষ কী তবে !
চেঁচিয়ে বলাই ভাল,
কাকেদের মরণ এত
বাড়বার কারণ যত
টিভি কোম্পানিগুলো ।
কেননা এই শহরে,
গাছেদের সব কোটরে,
গাদাগাদি পাখির বাসা ।
অথচ অ্যান্টেনারা,
স্মার্ট আর সবার সেরা,
বসবার জায়গা খাসা ।
কিন্তু হায় রে কপাল,
যেন-সব সাক্ষীগোপাল
দেখতেই বাহার ভারী,
আসলে পলকা খোঁড়া
বসলেই উলটে মরা
কাণ্ড কী ঝকমারি !
তাই কাল মিটিং শেষে
কাকেরা সবাই বসে
প্রস্তার করল খাড়া :
টিভি অ্যান্টেনাগুলো
সব ক'টা রাঙামুলো
একেবারে আগাগোড়া ।
কাকেদের ওয়েলফেয়ার
ব্যাপারে নজর দেওয়ার
দায় সব শহরবাসীর,
তাঁদেরই দেখতে হবে
কীভাবে এবং কবে
কাকেদের ঠোঁটে হাসি
ঝলমল উঠবে ফুটে,
যত কোম্পানি জুটে,
বানাবে পোক্ত জিনিস
মানে ওই অ্যান্টেনারা
ফিনফিনে শয়তানেরা
হবে বেশ শক্ত-ফিনিশ ।

কোন্ আক্কেলে

প্রভাকর মাঝি

সকল সময় রাজু রে, তোর
উঠছে নোলা সকসকিয়ে ?
হ্যাংলা হয়ে উঠেছিস খুব
বংশীমামার বাড়ি গিয়ে ।
জিভের একটু সংযম চাই,
সব ব্যাপারে লোভ ভাল নয়,
লোভে পাপ আর পড়েছিস তো
পাপের থেকে কী যেন হয় !
চিরকালের পেটরোগা, তাই
তোরই ভাল হবে দেখে
দু'মুঠো খই দিয়েছিলুম,
মণ্ডাগুলো নিজে রেখে ।
ওমা, কখন বড়দিকে তা
লাগিয়ে দিলি তলে তলে,
পরের ভাল করতে যে নেই,
নেমকহারাম একেই বলে !
যেমনি হচ্ছে স্বভাব, তেমনি
চেহারাটাও পেঁচোয়-পাওয়া
খাওয়ার জন্যে বাঁচা, না বল,
বাঁচার জন্যে খেয়ে যাওয়া ?
পেটরোগাদের কেউ কখনও
মিষ্টিটিষ্টি দেয় কি সেধে ?
দুধ আর সাগু পথ্য তাদের
লেখাই আছে আয়ুর্বেদে ।
তবু আমার দয়াতে তুই
এই তো হুড়ুমভাজা খেলি,
পান্তো সবে বাইশটা, ফের
কোন্ আক্কেলে চাইতে এলি ?

ছবি : দেবাশিস দেব

"আমিও জ্যাজাইয়ের সঙ্গে ভোট দিতে যাব !"

পিতুর ভোট দেওয়া

বাণী বসু

নির্বাচন হয়ে গেছে। তোমাদের যদি একটা সহজ প্রশ্ন করি, নিশ্চয় উত্তর দিতে পারবে ! এই নির্বাচনে সর্বকনিষ্ঠ ভোটদাতার বয়স কত ? নিশ্চয় সবাই হৈহৈ করে উঠেছ ! এ আবার একটা প্রশ্ন নাকি ? কুইজ করে-করে যখন তোমরা চাঁদের ওজন, শনির বায়ুমণ্ডলের উপাদান, আমেরিকার সমস্ত প্রেসিডেন্টের ঠিকুজি-কুলুজি, পৃথিবীর সর্বপ্রথম পেশাদার গোয়েন্দার নাম-ধাম ইত্যাদি নিমেষের মধ্যে বলে দিতে পারো, তখন কিনা তোমাদের এই প্রশ্ন ? তোমরা নিশ্চয় বলবে, উত্তরটা হবে ঠিকঠাক একুশ বছর। কেউ-কেউ আবার খুব চালাক-চালাক গলায় বলবে, ভোটের দিন যার একুশ বছর পূর্ণ হয়েছে, এমন কেউই এবারের সর্বকনিষ্ঠ ভোটদাতা। কারণ একুশ বছরটাই ভোটদানের যোগ্যতার সর্বনিম্ন বয়ঃসীমা। কেমন তো ? এবার তোমরা কঠিনতর প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত হচ্ছ, নয় ? কিন্তু না। আর কোনও প্রশ্নই আমি তোমাদের করব না, কারণ তোমাদের প্রথম উত্তরটাই ঠিক হয়নি। এবারের নির্বাচনের সর্বকনিষ্ঠ ভোটদাতার বয়স সাড়ে চার। নাম পিতু। ঠিকানা ৩/১/এ ব্যাপটিস্ট বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোড, হাওড়া—৬। প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, পোলিং এজেন্ট, এঁরা সাক্ষ্য দেবেন কি না জানি না। কিন্তু ব্যাপটিস্ট বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোডের বাসিন্দারা বিনা দ্বিধায় সাক্ষ্য দেবে। তাদের তো আর সরকারি নিয়মকানুনকে অত ভয় করে চলতে হয় না ! তা ছাড়া তাদের সবারই এই ভোটে সায় ছিল।

এই অসাধারণ ব্যক্তিটির সম্পর্কে নিশ্চয় তোমাদের জানতে কৌতূহল হচ্ছে ! স্টেশনারি দোকানে নাইলনের ডল দেখেছ ? পিতু হচ্ছে ঠিক এইরকম দেখতে একটি মেয়ে। তিনমাস বয়সে পিতুকে হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করতে দেখে নবনিযুক্ত কাজের লোক অন্ন মন্তব্য করেছিল, "ওমা ! কী সোন্দর, এ যে লক্ষ্মীর পিতিমে গো !" সেই থেকে নাম পিতু। ভাল নাম এখনও রাখা হয়নি, আর রাখা যাবে বলেও মনে হচ্ছে না। কারণ পিতু নামটা আস্তে আস্তে বিপুল খ্যাতি অর্জন করছে।

পিতুর চুলের রং গঙ্গামাটির মতো। আঙুরের মতো থলো-থলো। আঁচড়িয়ে সিঁথি বার করা যায় না, গুটিয়ে-গুটিয়ে যায়। পিতু এমনই পুতুল-পুতুল, খুকি-খুকি চেহারার মেয়ে যে, তাকে যদি চার্লি চ্যাপলিনের মতো একটা ঢোলা পেণ্টুলুন, মাথায় ঢ্যাপঢেপে টুপি এবং পায়ে একজোড়া পেল্লাই গামবুট পরিয়ে দেওয়া হয়, তার ওপর নাকের নীচে

এঁকে দেওয়া হয় পাকানো দুই ভোজপুরী গোঁফ, তা হলেও লোকে বলবে : "বা রে, খুকিটা তো ভা—রী মিষ্টি !"

কিন্তু পিতু খুব রোগা। কারণ পিতু অনেক কিছু খায় না। এবং পিতু অনেক কিছু খায়। যেমন দুধ দেখলে পিতু বেঁকে যায়, মাছ পাতে নিলে খকখক করে কাসতে শুরু করে, ডিম দেখলে বন্দুকের গুলির মতো ছিটকে বেরিয়ে যায়, মাংস-টাংসর সঙ্গে সে সজনে ডাঁটার মতো ব্যবহার করে, অর্থাৎ চিবিয়ে-চিবিয়ে ফেলে দেয়। ফলের মধ্যে আপেল, কমলালেবু, কলা ইত্যাদি দেখলে পিতুর ভীষণ ঘেন্না করে। একমাত্র লিচু, আতা ও তেঁতুল সে পছন্দ করে, নানান সাইজের বিচি সংগ্রহ করা যায় বলে। এবং ডাঁশা পেয়ারা—বল খেলবার জন্য।

পিতু কী খায় ? ধরো, পিতুর বাবা সকালবেলা অফিস যাবার জন্য রেডি হচ্ছেন। পিতু মোক্ষম সময়টিতে গিয়ে আবদার ধরল, "বাঁবাঁ, পঁচিশটা নঁয়া দাঁও।" বাবার খুব তাড়াতাড়ি আছে, তিনি বললেন, "আচ্ছা, এই নাও।" ছোট-ছোট, নরম-নরম মুঠিতে মাঝে-মাঝে এরকম পয়সা-টয়সা গুঁজে দিতে কার না ভাল লাগে ? দিয়ে বাবা বললেন, "দেখো, চানাচুর খেয়ো না যেন !" চানাচুর-টুর খাওয়া পিতুর একদম বারণ। পিতু তার গঙ্গামাটি-রঙের থলো-থলো চুল দুলিয়ে বলে, "আচ্ছা, বাবা।" বিকেলবেলায় ফিরে বাবা দেখেন পিতু একটা পাকানো খিলিমতো লম্বা ঠোঙা থেকে খুঁটে-খুঁটে মনোযোগ দিয়ে কী খাচ্ছে।

"কী খাচ্ছ, পিতু ?"

"কিচ্ছু না বাবা।"

"আমি যে দেখছি কিছু··· !"

"হরিদাসের বুলবুলভাজা।"

"আমি যে তোমায় চানাচুর খেতে বারণ করে গেলাম !"

"আমি তো চানাচুর খাইনি বাবা, এ তো বুলবুলভাজা !"

এ ছাড়াও পিতুকে ঘুগনি বারণ করলে সে চটপটি খায়, চটপটি বারণ করলে ঘুগনি, ফুচকা বারণ করলে গোলগাপ্পা, গোলগাপ্পা বারণ করলে জলকচুরি। আইসক্রিম বারণ করলে কুলপি, কুলপি বারণ করলে মালাই বরফ। বাবা পয়সা না দিলে জ্যাঠা দেন, জ্যাঠা না দিলে কাকু দেন, কাকু না দিলে দাদু, দাদু না দিলে পাশের বাড়ির নিতাইকাকু, গোরাদা, সীতেশ পিসে, নিতু মেসো··· । পিতুকে সানন্দে চাঁদা দেয় না, এমন লোক ব্যাপটিস্ট বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোডে একটিও নেই। কেন ? ওই যে বললুম, নরম-নরম, ছোট-ছোট মুঠিতে এটা-ওটা গুঁজে দিতে কার না ভাল লাগে ? তা ছাড়া পিতু তো বাধ্য, যা খেতে বারণ করা হবে, তা তো সে কক্ষনো খাবে না, তবে ? কাজেই, পিতুর বারোমাস পেটের অসুখ, বারোমাস সর্দিকাসি। পিতু খুব রোগা। কিন্তু সে যখন কাঁদতে আরম্ভ করে, তখন আড়াল থেকে শুনলে লোকে বলবে, এ নির্ঘাত কোনও ভীমখুকুর কান্না। তার দরাজ গলার আওয়াজ শুনে গান-পাগল ছোটকাকার আশা, ভবিষ্যতে সে একটা আখতারি বাঈ কি গাঙ্গুবাঈ হাঙ্গল-টাঙ্গল হলেও হয়ে যেতে পারে।

এই পিতুই ভোট দিয়েছিল। ব্যাপটিস্ট বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোডে ভোটের ক'দিন আগে থেকেই উৎসবের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। রাস্তার দু'দিকে দুই দলের পোস্টার। ছবি আর ছড়াও আছে। ছড়ায় আছে ওতোর-চাপান। কেউ কম যায় না।

এই রাস্তার লোকেদের আবার বিশেষ সুবিধে এই যে তাদের জনকল্যাণ সমিতির ক্লাবঘরেই পোলিং বুথ হয়েছে। দূরে কোথাও যেতে হবে না। টুক করে সময়-সুবিধে বুঝে ভোটটি দিয়ে এসো। বাস্। বাড়িতে, পাড়ার মোড়ে, রকে নানান আলোচনা চলছে। পিতু তার ছোটকাকাকে বললে, "তুমি তো, কাকু, ইস্টবেঙ্গলকে ভোট দেবে, না ? আর জেঠু মোহনবাগানকে ?" তর্কাতর্কি শুনে পিতু ধরেই নিয়েছে, এ নির্ঘাত আবার সেই ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের ব্যাপার। ছোটকাকা পিতুকে কোলে করে খুব সোজা করে মিষ্টি করে বুঝিয়ে দিলেন, এ ফুটবল খেলা নয়, হুঁ হুঁ ব্বাবা ! ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, নেতা নির্বাচন।

পিতু ক্রমে-ক্রমে এও জানল যে, তাদের বাড়ির সব্বাই ভোট দিতে যাবে। এমন কী, অন্নদিও। এমন কী, হারুও, যে হারু তার একমাত্র অবাধ্য প্রজা। যাবে না শুধু সে, মিন্টু, পুতলি, বোঁচকা, রঙ্গু (পোষা হুলো) এবং পপ্‌সি (কুকুর)। পিতু খুব নিশ্চিন্ত মনে আঙুল চুষতে চুষতে বলল, হারু যদি ভোট দেয়, তা হলে সেও দেবে। দেবেই।

নির্দিষ্ট দিন। সাতটা থেকে বুথ খুলবে। আগের দিন সারারাত সমিতি-ঘরে হারিকেনের আলো জ্বলেছে এবং খুব রোগা ও ক্লান্ত কিছু পোলিং অফিসারকে সেখানে কাঠের বেঞ্চিতে শুয়ে সারা রাত চটাস চটাস করে মশা মারতে শোনা গেছে। এঁদের মধ্যে একজনকে পিতুর দাদু বাড়িতে ডেকে এনে খাইয়েছেন, বেচারি আসছেন সেই ঘাটাল থেকে। তিনি পিতুকে লজেন্স কেনবার পয়সা দিয়েছেন, পিতু বদলে তাঁকে বাঘবন্দী খেলবার জন্য কিছু কাঁইবিচি দিয়েছে। এতটা ত্যাগস্বীকার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব না হলে পিতু করে না। যাই হোক, সাতটায় যখন বুথের দরজা খুলল, দেখা গেল, বিরাট লাইন হয়ে গেছে। সাড়ে পাঁচটা থেকে সব লাইন দিয়েছে। পিতুদের এবং আশপাশের সব বাড়ির গ্যালারি অর্থাৎ জানলা, বারান্দা, রোয়াক ইত্যাদি বোঝাই ভবিষ্যৎ-ভোটদাতাদের দ্বারা। দলে দলে জানলার শিক ধরে ঝুলছে, বারান্দার রেলিঙে পা দিয়ে বিপজ্জনকভাবে কোমর অবধি ঝুঁকিয়ে দিয়েছে। পেছনে পা ধরে টানাটানি করছে পরবর্তী খুদে অপেক্ষাকারীরা। সবার লক্ষ্য নিজের বাড়ির ভোটদাতাটি বা ভোটদাতারা লাইনের ঠিক কোন্‌খানে দাঁড়িয়ে, কী গতিতে এগোচ্ছেন, এবং সমিতির জানলা দিয়ে রহস্যজনক ভোটপর্ব কিছু দেখা যায় কি না।

ইতিমধ্যে বেশ কিছু উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেল। দুটি বোগাস ভোটদাতা ধরা পড়ল। প্রথম সন্দেহজনক ব্যক্তিকে র‍্যাশনকার্ড আনতে বলায় সে তার বুকের ছাতি, বাইসেপস, ট্রাইসেপস দেখাতে থাকে। আর একজন লম্বা ঘোমটা-দেওয়া অবাঙালি মহিলা কিছুতেই তাঁর স্বামীর নাম বলতে রাজি না হওয়ায় পেছনের এক রসিকা মহিলা তার ঘোমটা ধরে টান দেন। তাইতেই দেখা যায়, সে স্থানীয় শ্যামা গুণ্ডার মেজোভাই, গোঁফদাড়ি কামিয়ে, নাকে যাত্রাদলের নথ লাগিয়ে লজ্জাশীলা বধূ সেজে এসেছে।

এই রকম হৈহৈ করে সকালটা কাটতে দুপুর দেড়টা নাগাদ পাড়ার ছেলেরা এসে পিতুর ঠাকুমাকে ধরল। "ঠাকুমা, এবার আপনি আসতে পারেন, মেয়েদের কিউ প্রায় ফাঁকা।" পিতুর

ঠাকুমা হলেন পিতুর বাবা-কাকার জ্যাঠাইমা। সুতরাং পিতুর জ্যাজাই। জ্যাজাইয়ের সারাদিন সংসারের শতকর্ম। তিনি আগে থাকতেই বলে দিয়েছিলেন, কেরোসিনের লাইন দিতে হলে তিনি ভোট-টোট দিতে পারবেন না। ভোটদানের অধিকার, দায়িত্ব, রাজনৈতিক সচেতনতা, এসব সম্বন্ধে পিতুর জ্যাঠা-দাদুর লম্বা-লম্বা বক্তৃতাতেও কোনও ফল হয়নি। যাই হোক, পাড়ার ছেলেরা ছাড়বে কেন? অতএব জ্যাজাই এগোলেন। কিন্তু ও কী! পিতুও যে আঁচল ধরে সঙ্গে-সঙ্গে এগোয়! মুখে এক কথা, "আমিও জ্যাজাইয়ের সঙ্গে ভোট দিতে যাব।" আজ অবধি জ্যাজাই কোথাও গেছেন, অথচ পিতু যায়নি, এমন ঘটেনি। পিতুর লেখাপড়ার স্থান রান্নাঘরের ছোট মোড়া। পিতুর জ্বর-জ্বারি হলে জ্যাজাইকে কিছুদিনের জন্যে সংসার ত্যাগ করতে হয়। কাজেই জ্যাজাই ভোট দিতে যাবার সময়ে পিতু পিছু নেবে, এ আর বিচিত্র কী!

পাড়ার ছেলেরা বলল, "আহা, যাক না, আমরা তো আছি!" ঠাকুমা বেরোনোর সময় ছেলেরা কানে-কানে কী বলল, তাদের দাদুও অন্য কানে কী যেন বললেন। পিতু শুনতে পেল "...মনে থাকে যেন!" এইটুকু দু'পক্ষেরই এক; বাকিটা আলাদা। জ্যাজাই একগাল হেসে ঘাড় নাড়লেন। ছেলেদের কথাতেও, জ্যাঠা-দাদুর কথাতেও।

যাই হোক, পিতু লাইন দিয়েছে। অশেষ ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুলিস রামকিষন পাঁড়েজি তার আশু কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে মাঝে-মাঝেই "খোঁকি, লাল-পাগড়ি হোবে? মোচ বাঢ়বে? চোট্টা পাকড়াবে?" ইত্যাদি ঠাট্টা করছে, এমন সময় পিতুর ঠাকুমার ভোট-ঘরে ঢোকবার পালা এল। রামকিষণ এবার পিতুকে রুখে দিল। "বাস্, অন্দর যাবে না। খাড়াও, হমার সঙ্গে গপ্‌সপ্ করবে।" আর তখনই আরম্ভ হল পিতুর সেই হাঙর-মার্কা কান্না। "আমার জ্যাজাই চলে গেল, আমায় নিল না...আ...আ...আ...।" এতদিন লোকে পড়েই ছিল, আজ সব স্বকর্ণে শুনতে পেল বুথসাহেবের বাচ্চার কান্নাখানা কীরকম। ভোট ভণ্ডুল হয় আর কি। অবশেষে সমবেত ভোটে স্থির হল খুকিটিকে ঢুকতে দেওয়া হোক। ঢুকবে বই তো নয়! চোখ-মুখ কান্নায় ডোরাকাটা পিতু আবার জ্যাজাইয়ের সামিল হল। প্রথম ঘরে নাম-ধাম যাচাই। তিন পোলিং অফিসারের একজন টিপসই নিলেন, আর-একজন ব্যালটপেপার ভাঁজ করে রবার স্ট্যাম্প হাতে ধরিয়ে দিলেন, তৃতীয় জন আঙুলে দাগা দেবার জন্যে তৈরি। পিতুও হাত বাড়িয়ে দিল, "ভূপতিকাকু, আমার ছাপ!" ইনিই সেই হতভাগ্য পোলিং অফিসার, যাঁর সঙ্গে পিতুর পয়সা ও কাঁইবিচি বদলা-বদলি হয়েছিল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে তিনি পিতুর আঙুলে ছাপ লাগিয়ে দিলেন।

অন্য ঘরটিতে খানিকটা জায়গা চট দিয়ে আড়াল করা। ভেতরে লণ্ঠন জ্বলছে। এইখানেই ভোটের কাগজে ছাপ মারতে হবে। পিতু ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, "আমিও যাব।" জ্যাজাইয়ের আঁচলের সঙ্গে তার মুঠোর গাঁটছড়া আরও শক্ত হল। জ্যাজাই ঝটকা মারতেই ভ্যাঁ। রামকিষন তাড়াতাড়ি এসে কোলে নিল। প্রিজাইডিং অফিসার হাতের কাছে কিছু না পেয়ে নিজের গোল্ডটিপ্‌ড্ পার্কার পেনটা পিতুর চোখের সামনে ধরলেন। "এই দ্যাখো খুকু, কী সুন্দর কলম, নেবে?" পিতু তৎক্ষণাৎ রাজি। আড়াল-করা জায়গাটার দিকে সে

আঙুল দিয়ে দেখাল। সে কলম নেবে, লিখবে, কিন্তু ওইখানে। রামকিষনের কোল থেকে সে সমস্ত শরীর ওইদিকে ঝুঁকিয়ে দিল।

পিতুদের বাড়ি একেবারে সামনে। সবই দেখা যাচ্ছিল। রঙ্গু, পপ্‌সি, মিন্টু, পুতলি, বোঁচকা সকলেই খুব উল্লসিত দেখা গেল। পপ্‌সি অনেক বারণ সত্ত্বেও রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে ভৌ ভৌ করতে লাগল, সঙ্গে রঙ্গুর হিয়াঁ-হিয়াঁও। যেন দু'জনে মিলে পিতুকে থ্রি চিয়ার্স দিচ্ছে। এরই মধ্যে সবাই সবিস্ময়ে দেখল, পিতুর কান্না থেমে গেছে, এবং ডোরাকাটা মুখে সে পুলিসের কোলে চড়ে ভোটঘর থেকে বেরিয়ে আসছে।

বাড়িতে পৌঁছে পিতু সগর্বে সবাইকে আঙুলের ছাপ দেখাতে লাগল। সে তার কথা রেখেছে, ভোট দিয়েছে। এবং সেই সঙ্গে সে আর-একটি কাজও করেছে। জ্যাজাইয়ের সিক্রেট ব্যালটের সিক্রেট ফাঁস করে দিয়েছে। জ্যাজাই জ্যাঠা-দাদুর কথাও শোনেনি। বুড়ো-ভুতোদাদের কথাও শোনেনি। অচেনা কোন্ চিহ্নে সে আর জ্যাজাই দুজনে মিলে প্রাণপণে ছাপ মেরে এসেছে। যাতে একদম ভুল না হয়। সবাই মিলে জ্যাজাইকে ঘেরাও করলে তিনি বলেছেন, "ভোট দোব কেন রে? র‍্যাশনের চাল মুখে তোলা যায় না, সারা বছর বোমবাজি, রাত্তির তেরোটা পর্যন্ত না দেবে একটু ঘুমোতে, না দেবে একটু জিরুতে...যা, তোর দাদুর গরমেন্টকেও ভোট দোব না, তোর বুড়ো-ভুতোর গরমেন্টকেও ভোট দোব না!"

ছবি অনুপ রায়

অবাক শিষ্যটি আনন্দবাবুর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল

মহাযোগী সম্মেলন ও ডমরুবাবা

প্রবীর ঘোষ

নয়াদিল্লিতে তিন দিন ধরে আন্তর্জাতিক মহাযোগী সম্মেলনের শেষে আজ প্রকাশ্য অধিবেশন। এই তিন দিনের সম্মেলনে এক-এক দেশ থেকে এসেছেন এক-এক ধরনের অলৌকিক শক্তির অধিকারী। এঁদের কেউ শুধু হাত নেড়েই আগুনের সৃষ্টি করতে পারেন। কেউ দীর্ঘ দিন প্রাণস্পন্দনকে থামিয়ে দিয়ে সমাধিস্থ থাকতে পারেন। কেউ আবার লিখে যে-কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। আজকের প্রকাশ্য অধিবেশনে সম্মেলনের তরফ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ভারতের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকদের। অলৌকিক ক্ষমতার বাস্তব উদাহরণ দিতে উপস্থিত হবেন সম্মেলনের সভাপতি এলাহাবাদের প্রখ্যাত তান্ত্রিক ডমরুবাবা।

অধিবেশন শুরু হতে এখন পনরো মিনিট বাকি। এরই মধ্যে আইফ্যাক্স হলের প্রতিটি আসন আমন্ত্রিত দর্শকে ভর্তি হয়ে গেছে। দর্শকদের দেখলে বুঝতে অসুবিধে হয় না, এঁরা প্রত্যেকেই বিশিষ্ট। আর একটা লক্ষ করার মতন ব্যাপার, দর্শকদের প্রায় অর্ধেকই মহিলা। ভারতে এই ধরনের অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের অনুষ্ঠান এই প্রথম। তাই, প্রতিটি দর্শকই প্রচণ্ড আগ্রহ ও উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছেন। সাংবাদিক ও প্রেস-ফোটোগ্রাফারদের বসানো হয়েছে প্রথম দিকের কয়েকটি সারিতে। ওঁদের সারিগুলোকে আলাদা করে বোঝানোর জন্যে একটা বোর্ড টাঙানো হয়েছে : 'PRESS BOX'।

দ্বিতীয় সারির মাঝখানের কোণ থেকে বসেছেন আনন্দ ঘোষ, তাঁর স্ত্রী প্রীতি ও ছেলে পিংকি। পিংকির পাশের আসনে বসেছেন আনন্দবাবুর তরুণ বন্ধু 'সায়েন্স' পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক ডঃ অমিত চক্রবর্তী। আনন্দবাবু ব্যাংককর্মী হলেও এসেছেন কলকাতার একটা নামী পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে। সঙ্গে এসেছেন তাঁর স্ত্রী। ওঁদের একমাত্র ছেলে দশ বছরের পিংকিও এসেছে সঙ্গে। বাবার পরিচিত সাংবাদিক বন্ধুদের সহযোগিতায় পিংকিও বাবা-মা'র সঙ্গে প্রেসের জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসার সুযোগ পেয়েছে।

আমন্ত্রিত সবাইকেই একটা করে স্মারক-পত্রিকা দেওয়া হয়েছে। তাতে প্রথম পাতা-জোড়া ছবিটিই হল তন্ত্রসাধক ও সম্মেলনের সভাপতি ডমরুবাবার। পরের দু'টো পাতায় ছাপা হয়েছে ডমরুবাবার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায় মুগ্ধ বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রশংসাপত্র। তারপরের পাতাগুলোতে রয়েছে বিশ্বের এগারোজন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী সাধকের ছবি ও পরিচয়। এঁরা এসেছেন মন্ট্রিয়ল, শিকাগো, বেলফাস্ট, লিসবন, কায়রো, জাকর্তা, বাগদাদ, তেহেরান, থিম্পু ও কাঠমাণ্ডু থেকে। এ ছাড়াও আর যে দু'জনের ছবিসহ পরিচয় ছাপা হয়েছে, তাঁরা হলেন সম্মেলনের আহ্বায়ক গোবিন্দ মাকোয়ানা ও প্রধান অতিথি বিখ্যাত ব্যবসায়ী শিবকৃষ্ণ আয়ার।

ঘড়ি ধরে ঠিক সন্ধে ছ'টায় মঞ্চের পর্দা উঠল। গোবিন্দ মাকোয়ানা মাননীয় অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে শিবকৃষ্ণ আয়ারকে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করতে আহ্বান জানালেন। মালা পরিয়ে প্রধান অতিথিকে বরণ করা হল। আয়ার প্রদীপ জ্বালিয়ে সভার উদ্বোধন করে ভাষণ শুরু করলেন ইংরিজিতে। পাক্কা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে উনি নানা

যুক্তি ও তথ্য দিয়ে বোঝাতে চাইলেন, নতুন করে আজ আবার অলৌকিক শক্তি নিয়ে চর্চা করার সময় এসেছে। বিজ্ঞান যতই এগিয়ে থাকুক, তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সীমাহীন অলৌকিক শক্তিকে আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই। অলৌকিক শক্তির প্রভাবে জর্জিয়ার এক মহিলা রাশিয়ার প্রাক্তন নায়ক ব্রেজনেভকে দীর্ঘ দিন সুস্থ রেখেছিলেন। বোম্বাইয়ের ডাক্তার মহেশ কোনিও অলৌকিক শক্তির সাহায্যে দূর-দূরান্তরের রোগীদের না-দেখেই সুস্থ করে তুলছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউরি গেলার তো এই তরুণ বয়েসেই কিংবদন্তী-পুরুষ হয়ে উঠেছেন। তিনি অলৌকিক ক্ষমতায় স্টিলের চামচের মতন জড় পদার্থকেও সম্মোহিত করে বাঁকিয়ে ফেলতে পারেন। বিজ্ঞানের যুক্তির বাইরে এখনও অনেক কিছুই ঘটে চলেছে, যুক্তিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না।

বক্তৃতা শেষ হতেই প্রচণ্ড হাততালি পড়ল। তবে সেটা ভাল বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে, না বক্তৃতা থামানোর জন্যে, তা বলা মুশকিল।

সবাই এসেছেন অলৌকিক কিছু দেখতে। শুধু বক্তৃতায় কি মন ভরে ?

গোবিন্দ মাকোয়ানার আহ্বানে একে-একে হাজির হলেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এগারোজন। এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দিতে কেটে গেল আরও তিরিশটা মিনিট। সবশেষে হাজির হলেন আজকের প্রধান আকর্ষণ তান্ত্রিক ডমরুবাবা। ছিপছিপে চেহারা, টকটকে গায়ের রঙ, মাথায় বাবরি চুল, মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফ, গলায় তিনটে রুদ্রাক্ষের মালা, বয়েস পঞ্চান্ন থেকে পঁয়ষট্টির মধ্যে।

ডমরুবাবা দর্শকদের শুভেচ্ছা জানিয়ে দু'জন সাংবাদিক ও একজন দর্শককে মঞ্চে আহ্বান জানালেন।

প্রথম সারিতে বসে ছিলেন 'ক্ল্যারিয়ন' পত্রিকার উন্নিকৃষ্ণন ও 'সত্য সমাচার' পত্রিকার রবি তুলপুলে। তাঁরা মঞ্চে উঠলেন। পিছু-পিছু উঠলেন এক মধ্যবয়স্কা সুন্দরী মহিলা। ডমরুবাবার এক শিষ্য ডমরুবাবার পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে রাইটিং-প্যাড ও কলম।

ডমরুবাবা হিন্দিতে শুরু করলেন, "আপনারা তিনজনে এমন একটা করে প্রশ্ন আমাকে করবেন, যার উত্তর আপনাদের নিজেদের জানা। আমি প্যাডে উত্তর লিখে রাখব। তারপর আপনারা নিজেদের উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন ঠিক লিখেছি কি না।"

ডমরুবাবা প্রথমেই মহিলাটিকে প্রশ্ন করলেন, "আপনার নাম ?"

"শীলা গুপ্তা।"

"কী করেন ?"

"কিছু নয়। আমি বাড়ির বউ। স্বামী ব্যবসায়ী।"

"আপনার প্রশ্নটা কী ?"

"আমার মা-বাবা দু'জনেই কি বেঁচে আছেন ?"

ডমরুবাবা প্যাডে খসখস করে কী যেন লিখলেন। তারপর কলমটা বন্ধ করে শীলা গুপ্তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার মা বাবা দু'জনেই কি বেঁচে আছেন ?"

"উঁহুঁ, মা বছর দশেক আগেই মারা গেছেন।"

ডমরুবাবা প্যাডের পাতাটা মেলে ধরলেন শীলা গুপ্তার চোখের সামনে। "কী লেখা রয়েছে জোরে পড়ুন তো।"

"মা মারা গেছেন।"

এবার ডমরুবাবা প্যাডটা মেলে ধরলেন উন্নিকৃষ্ণন ও রবি তুলপুলের চোখের সামনে। "কী ভাই, তাই লেখা রয়েছে তো ?"

দু'জনেই মাথা নেড়ে জানালেন, তা-ই লেখা রয়েছে বটে।

ডমরুবাবা প্যাডের কাগজটা ছিঁড়ে শিষ্যের হাতে ধরিয়ে দিয়ে উন্নিকৃষ্ণনের দিকে ফিরলেন।

"আপনার নাম ?"

"উন্নিকৃষ্ণন।"

"আপনি তো সাংবাদিক। তা কোন্ পত্রিকায় কাজ করেন ?"

"ক্ল্যারিয়ন।"

"আপনার প্রশ্নটা কী ভাই ?"

"বাঙ্গালোরের মিঃ সুন্দরনকে কে খুন করেছে ?"

ডমরুবাবা শান্ত গলায় বললেন, "যোগের দ্বারা যে অলৌকিক কিছু ঘটানো সম্ভব, সাধারণ মানুষের কাছে তা তুলে ধরাই আজকের অনুষ্ঠানের লক্ষ্য। কোনও খুনিকে ধরা লক্ষ্য নয়। তা ছাড়া খুনির নাম বললেও আপনারা কি প্রমাণ করতে পারবেন যে, সে-ই খুন করেছে ? তার চেয়ে এমন প্রশ্ন করুন, যাতে দর্শকরা বুঝতে পারেন, সব কিছুই বুজরুকি নয়, অলৌকিক বলেও কিছু আছে।"

"বেশ, বলুন তো আমার কটি সন্তান ?" উন্নিকৃষ্ণন তাঁর পঞ্চাশ বছরের স্মার্ট মুখে হাসি ঝুলিয়ে প্রশ্ন করলেন।

ডমরুবাবা রাইটিং-প্যাডে কিছু হিসেব কষতে লাগলেন। তিরিশ থেকে পঁয়তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যে লেখা শেষ করে কলম বন্ধ করে প্রশ্ন করলেন, "আপনার কটি সন্তান, মিস্টার ?"

"একটিও নয়। বিয়েই করিনি।"

"কিন্তু, প্যাডে যে অন্য কিছু লিখে ফেলেছি। দেখুন তো মিস্টার কী লিখেছি ?"

প্যাডটা মেলে ধরলেন রবি তুলপুলের চোখের সামনে।

তুলপুলে অবাক গলায় বললেন, "শূন্য লেখা রয়েছে।"

"তাই নাকি ? আপনি দেখুন তো মিসেস গুপ্তা।" এবার ডমরুবাবা প্যাডটা এগিয়ে ধরলেন শীলা গুপ্তার সামনে।

"হ্যাঁ, তাই লিখেছেন !" শীলা গুপ্তার গলায় বিস্ময়।

"মিস্টার উন্নিকৃষ্ণন, আপনি নিজেই বরং নিজের উত্তর দেখে নিন।"

উন্নিকৃষ্ণন প্যাডে চোখ বুলিয়ে নিচু হয়ে ডমরুবাবার পায়ের ধুলো নিলেন। মিসেস গুপ্তা এগিয়ে এসে ভক্তিভরে গলায় আঁচল টেনে প্রণাম করলেন। দু'জনের মাথায় হাত রেখে ডমরুবাবা বললেন, "শুভ হোক।"

দর্শকদের কেউ একজন চিৎকার করে উঠলেন, "বোলো বোলো ডমরুবাবা কি—"

অনেকে একসঙ্গে হল্ কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠল, "জয় !"

ডমরুবাবা দু'হাত তুলে জনতাকে শান্ত করলেন। এবার ফিরলেন মিস্টার তুলপুলের দিকে। "ভাইসাব, আপনার নাম ?"

"রবি তুলপুলে।"

"আপনি কোন্ কাগজে আছেন?"

"সত্য সমাচার।"

আগের উত্তর লেখা কাগজটা গোল্লা পাকিয়ে শিষ্যের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ডমরুবাবা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার প্রশ্নটা কী?"

"আমি কোন্ বছর প্রথম বিদেশে যাই?"

"গোটা-পাঁচেক সাল আপনি বলুন। তার মধ্যে প্রথম বিদেশ যাবার সালটাও বলবেন। আমি আসল সালটা লিখতে চেষ্টা করব। সাধনা হল গভীর মনঃসংযোগের ব্যাপার। এই ভিড় আর এমন চেঁচামেচিতে আমার মনঃসংযোগই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তবু চেষ্টা করে দেখি।"

রবি তুলপুলে বলে গেলেন, "১৯৭৮, '৭৯, '৮০, '৮১, '৮২।"

ডমরুবাবা প্যাডে খস্‌খস করে আঁক কাটলেন। লিখলেন। তারপর কলমটা বন্ধ করলেন। "এবার বলুন তো, কোন সালে গিয়েছিলেন?"

"১৯৮১ সালে।"

"মিস্টার উন্নিকৃষ্ণন, দেখুন তো কোন সাল লেখা রয়েছে?"

"১৯৮১ সাল।"

"মিসেস গুপ্তা, তাই তো?" ডমরুবাবা প্যাডটা ধরলেন শীলা গুপ্তার সামনে।

মিসেস গুপ্তা মাথা হেলিয়ে জানালেন উত্তর ঠিকই হয়েছে।

"মিস্টার তুলপুলে, ঠিক সালটা ধরতে পেরেছি তো?"

ছোট-খাটো ফরসা মাঝবয়সী রবি তুলপুলে জুলজুলে চোখে লেখাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চট্ করে নিচু হয়ে ডমরুবাবার পায়ের ধুলো নিলেন। ডমরুবাবা প্রশান্ত চোখে আশীর্বাদ করলেন। তারপর উত্তরের কাগজটা গোল্লা পাকিয়ে ধরিয়ে দিলেন শিষ্যের হাতে।

ঘন-ঘন ডমরুবাবার জয়ধ্বনিতে হল কাঁপতে লাগল। শিবকৃষ্ণ আয়ার ও গোবিন্দ মাকোয়ানাকে আবার মঞ্চে দেখা গেল। দু'জনেই ডমরুবাবার পদস্পর্শ করে আশীর্বাদ নিলেন।

আনন্দবাবু উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর ইশারায় 'সায়েন্স' পত্রিকার অমিত চক্রবর্তীও উঠে দাঁড়ালেন। দুজনে দ্রুত এগোলেন মঞ্চের দিকে। পিংকি উত্তেজনায় টানটান হয়ে বসল। প্রীতির বুক ঢিব-ঢিব করতে লাগল।

মঞ্চে উঠে শিষ্যটিকে পাশ কাটিয়ে ডমরুবাবার দিকে এগোলেন আনন্দবাবু ও অমিতবাবু। হঠাৎ আনন্দবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন। কিছু বোঝার আগেই শিষ্যটির হাত থেকে কাগজের গোল্লাগুলো ছোঁ মেরে তুলে নিলেন। অবাক শিষ্যটি মুহূর্তে আনন্দবাবুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। কিন্তু পারল না। অমিতবাবু ওকে শক্ত হাতে ধরে ফেলেছেন। আনন্দবাবু অতি দ্রুত কাগজের গোল্লা তিনটি তুলে দিলেন রবি তুলপুলে, উন্নিকৃষ্ণন ও শীলা গুপ্তার হাতে।

"কাগজগুলো খুলে পড়ুন আপনারা।" উত্তেজিত গলায় কথাগুলো বললেন আনন্দবাবু।

শীলা গুপ্তার হাতে থাবা মারতে গেলেন ডমরুবাবা। কিন্তু, তার আগেই ডমরুবাবার হাত দুটো আনন্দবাবু শক্ত হাতে ধরে ফেললেন।

"কী হল? কাগজে কী লেখা আছে, আপনারা দর্শকদের পড়ে শোনান।" আনন্দবাবুর গলায় তীব্র উত্তেজনা।

"আমার কাগজে তো বিভিন্ন জায়গায় '৭৮, '৭৯, '৮০, '৮১, '৮২, পাঁচটা সালই লেখা রয়েছে।" অবাক চোখে কথাগুলো বললেন মিসেস গুপ্তা।

মিস্টার তুলপুলে চেঁচিয়ে উঠলেন, "আমার কাগজের এক পিঠের কোণে লেখা রয়েছে—মা মৃত। অন্য কোণে লেখা—বাবা মৃত। আর কাগজের উল্টোপিঠে লেখা রয়েছে—মা বাবা জীবিত।"

উন্নিকৃষ্ণন বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠলেন। "এতে এক পিঠের দু'পাশে লেখা রয়েছে ১ এবং ২। আবার ১-এর কিছু তলায় লেখা ৩। ২-এর কিছুটা তলায় ৪। কাগজটার পিছনে লেখা রয়েছে শূন্য।"

আনন্দবাবুর মুখে এবার হাসি ফুটেছে। বললেন, "হ্যাঁ, আপনারা এবার ঠিকই দেখছেন। যে উত্তরগুলো হওয়া সম্ভব, তা সবই প্যাডে লিখে রেখেছিলেন ডমরুবাবা। আপনাদের মুখ থেকে উত্তর শোনার পর প্যাডের কাগজ ভাঁজ করে এবং একদিকের লেখা আঙুল দিয়ে ঢেকে রেখে প্রয়োজনীয় উত্তরটা দেখিয়েছিলেন।"

না, আর কিছুই বলার সুযোগ পেলেন না আনন্দবাবু। তার আগেই শীলা গুপ্তার প্রচণ্ড একটি চড় এসে পড়ল ডমরুবাবার গালে।

ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশগানের আলো বিদ্যুৎ-চমকের মতনই ঘন-ঘন চমকাতে লাগল। সমস্ত হল জুড়ে শুরু হয়ে গেছে মহাযোগী সম্মেলন আর ডমরুবাবার মুণ্ডপাত করে ঘন-ঘন স্লোগান।

ছবি কৃষ্ণেন্দু চাকী

ধাঁধা

মাঝে-মধ্যে যেমন ছোট্‌কা দারুণ কঠিন সব ধাঁধা দেয়, তেমনি মেজাজ খুব খুশি থাকলে ছোট্‌কা মজার-মজার নানান সহজ প্রশ্নও করে। এই তো কদিন আগে কাগজে বেরুচ্ছিল, ডাকবিভাগে কাজকর্ম সব বন্ধ। ছোট্‌কার মনমেজাজ সেদিন নিশ্চয়ই খুব ভাল ছিল, কেননা কাগজ পড়তে-পড়তেই ছোট্‌কা আমাকে হঠাৎ প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, বল তো, ডাকপিওনেরা চিঠি বিলি করে কেন ?"

হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনে আমি কেমন হকচকিয়ে যাই। তারপর একটু ভেবে নিয়ে বলি, "এটাই তাদের কাজ, তাই।"

ছোট্‌কা হো-হো করে হেসে উঠল। হাসতে-হাসতেই মজার মুখ করে বলল, "কিন্তু আমি যদি বলি, এ-জন্য নয়, চিঠিরা নিজেরা হেঁটে-চলে যেতে পারে না, তাই। তা হলে ?"

ছোট্‌কার উত্তরটা এত মজার যে, আমিও হেসে উঠলাম। ছোড়দি ছিল ঘরে। ছোট্‌কার উত্তর শুনে ছোড়দি হঠাৎ বলল, "এ তো ধাঁধা নয়, এ হল 'উত্তর বটে'।"

সারা ঘরে আবার উঠল দ্বিগুণ হাসির রোল।

তা, যে-কথা বলতে গিয়ে এত কথা বলা। ছোট্‌কার সেই হালকা মেজাজের ফসল তিনটে ধাঁধা এবার দিচ্ছি। এগুলো তেমন কঠিন নয় মোটেই, বরং বেশ সোজা, বেশিরকমের সোজা। তাই উত্তর দেবার জন্য খুব বেশি সময় নেওয়া চলবে না। চটপট উত্তর চাই।

প্রথম ধাঁধা ॥ ১ থেকে ১০-এর মধ্যে এমন একটা সংখ্যা বলো, যাকে অর্ধেক করলে উত্তর হবে শূন্য।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ কী সেই জিনিস, যা ওলটালে মূল্য বেড়ে যায় ?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ কী সেই জিনিস, যা দিয়ে ফ্যাশন হয়, ফুটুনি হয়, অথচ যা বাজারে পাওয়া যায় না ?

গতবারের উত্তর ॥ (১) 4368, (২) Idle (৩) বরণডালা।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

১	২	■	৩	■	৪	
■	৫					■
■		■		■		■
৬		■		■	৭	৮
	■	৯		১০	■	
	■	১১			■	
১২			■	১৩		

সংকেত পাশাপাশি (১) চাষির ছাতা। (৪) পরীক্ষায় যা আসে। (৫) বনভোজন। (৬) যা না-থাকলে গাড়ি চলতে পারে না। (৭) প্রণালী, প্রথা। (৯) গাছবিশেষ। (১১) অধীনতা। (১২) নয়-ফোঁটার তাস। (১৩) হিমালয়ের কোলে কোন্ ঝাজ্য দোলে ?

উপর-নীচ (২) উজ্জ্বল সবুজ রঙের পোকা। (৩) বড়রা করেন, ছোটরা খাটে। (৪) দরোয়ান। (৬) এক ধরনের লম্বা জামা। (৮) পুরাণ পড়ে জানতে পেলে, এই প্রাণী তিমিমাছ গেলে। (৯) যদি বাজায় আনাড়ি, গানের দফা সারি। (১০) লতার মতো বিস্তৃত।

রঞ্জন

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

দে	ও	য়া	ল	■	মা	টি
হ	■	■	হ	■	মা	লা
র	■	জো	না	কি	■	■
ক্ষী	রি	কা	■	রা	জী	ব
■	■	র	জ	ত	■	র
বে	দ	■	খ	■	■	রু
দেঁ	হ	■	ম	শা	ল	চি

মজার খেলা

এবারের মজার খেলাটা এমনই মজার যে, এর উপকরণ বলতে গেলে কিছুই লাগবে না। তবে হ্যাঁ, হাতের কাছে যদি কাগজ-পেনসিল থাকে, তা হলে পরে সুবিধে হবে। কেননা, উত্তরটা মুখে বললেও দু-একজন বুঝতে পারবে না হয়তো, সেক্ষেত্রে কাগজ-পেনসিল থাকলে লিখে বুঝিয়ে দেওয়া সহজ হবে। সে অবশ্য পরের কথা, আগে মজার প্রশ্নটা তো শোনো।

প্রশ্নটা তুমি না হয় বন্ধুদেরই করবে, তাদের একটু জব্দ করবে প্রশ্নটা করে, তার আগে আমি বরং তোমার কাছেই প্রশ্নটাকে রাখি। কী বলো ? রাজি ?

বেশ। এবার বলো তো, ইংরেজি F ও E এই দুটি অক্ষরের সঙ্গে চার যোগ করে কী করে পাঁচ করা যায় ?

হ্যাঁ, এটাই প্রশ্ন। এ-প্রশ্নটাই তুমি বন্ধুদের সামনে রাখবে। আর এটা শুনে, তারা ঘাড় চুলকোবে, দু'-তিনবার জানতে চাইবে, কী বললে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তুমি মজা পাবে। দারুণ মজা। পাবে, পাবে।

কিন্তু তোমাকেই যখন প্রশ্নটা করা হচ্ছে তখন সেই মজাটা নেই কেন ? কী, তুমিও ঘাড় চুলকোচ্ছ ? বেশ, প্রশ্নটা আরও দু'-চারবার না হয় পড়েই নাও।

তবু উত্তর হচ্ছে না ?

তা হলে আর কী করা। বন্ধুদের ঠকাতে গিয়ে নিজেই যদি ঠকে যাও, উত্তর করে না-দেখাতে পারো, তাই বলেই দিই সমাধানের চাবিকাঠিটি কোথায়। F ও E দুধারে লিখে মধ্যে ফাঁক রাখো, সেই ফাঁকে বসাও রোমান হরফের চার, তা হলেই দেখবে, পরিষ্কার ফাইভ লেখা হয়ে যাচ্ছে—

FIVE

কী, 'পাঁচ' হল ? এখন তা হলে আর মুখটাকে বাংলার পাঁচ করে রাখা কেন ? বন্ধুদের ডাকো আর মজা করো।

মজারু

হাসিখুশি

"রেডিওতে অ্যানাউন্সার নেবে। ভাবছি একটা দরখাস্ত পাঠাব।"

"তোমার গলার আওয়াজ তো কয়েক মাইল দূর থেকেই শোনা যায়। কষ্ট করে আর রেডিওতে কাজ নেবে কেন ?"

"সকালে ফ্রিজে চারটে রসগোল্লা রাখলাম, এখন দেখছি একটাও নেই। বাড়িতে তো আমি আর তুই ছাড়া কেউ ছিল না পাপান।"

"ও প্রশ্নটা তো দাদা আমি তোমাকেও করতে পারি ?"

"যা রাগ হচ্ছে না আপনার উপর ! ইচ্ছে করছে একটি ঘুষি মেরে আপনার দু'পাটি দাঁত খুলে নিই।"

"আপনি অত কষ্ট করবেন কেন ? বাঁধানো দাঁত, আমি নিজেই খুলে দিচ্ছি।"

"ভুল করে একটা উচ্চিংড়ে খেয়ে ফেলেছি।"

"অত চিন্তা করছ কেন ? ওষুধ খেলেই ঠিক হয়ে যাবে।"

"না, না। নিজের জন্য চিন্তা করছি না। ভাবছি, উচ্চিংড়েটা না-খেতে পেয়ে মরবে।"

"আমাদের পূর্বপুরুষরা বাঁদর ছিল— ডারউইন সাহেবের থিওরিটা পড়ে আমি কিন্তু বেশ চিন্তার মধ্যে আছি। ভবিষ্যতে আবার আমরা বাঁদর হয়ে যাব না তো ?"

"তোমাকে দেখলে কেউ আর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করবে না।"

"অ্যাকাউন্ট্যান্ট মানে কী কাকু ?"

"অ্যাকাউন্ট মানে হিসেব আর অ্যান্ট মানে পিঁপড়ে। দুটো মিলিয়ে মানে হয় হিসেবের পিঁপড়ে।"

ছবি : দেবাশিস দেব

চেঁচিয়ে উঠলাম—'পকেটমার ধরেছি !'

পকেটমারের গল্প

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

বিপিনবাবুর বহুদিনের মনের সাধ পূরণ হল এ বছর। গিয়েছিলেন গঙ্গাসাগরে। 'সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার'। সেই তীর্থ সেরে এসে তিনি বি· বা· দি· বাগে গিয়েছিলেন বন্ধু নবীনের আপিসে। গঙ্গাসাগরের গল্প হল অনেকক্ষণ। সেখান থেকে বেরিয়ে ট্রামে উঠতেই তাঁর মনে হল কাঁধের ঝোলাটা ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছে। হাত ঢুকিয়ে দেখলেন ঝোলার ভিতরে চামড়ার ব্যাগটা নেই। গেল, বেশ কিছু গেল ! টাকা, চাবি, দরকারি কাগজপত্র—সব গেল। মনখারাপ হয়ে গেল। বিপিনবাবু ট্রাম থেকে নেমে পড়লেন। কোথায় পকেটমার ?

কী আর করেন ! চলে গেলেন শহরের দক্ষিণ প্রান্তে এক আশ্রমে। স্বামীজি মহারাজের কাছে। তাঁর সঙ্গে খুব জানাশোনা। তাঁর কাছে গেলেই ভাল লাগে।

তাঁকে দেখে মহারাজ হাসলেন। "আসুন আসুন। অনেক দিন বাদে দেখছি। কোথায় গিয়েছিলেন ?"

"গঙ্গাসাগর সেরে এলাম।" প্রণাম করে বললেন বিপিনবাবু।

"খুব ভাল কথা। তা মুখে হাসি নেই কেন ?"

তখন বিপিনবাবু জানালেন, তাঁর ঝোলা থেকে ব্যাগটি খোয়া গেছে।

মহারাজ এক গাল হাসলেন। "তাই বলুন, পকেটমার হয়েছে। দুনিয়ায় এমন কে আছে, যে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে, পকেটমার তার কিছু করতে পারেনি ?"

বিপিনবাবু শুধালেন, "আপনারও পকেটমার হয়েছে ?"

মহারাজ হাসলেন। "শুনুন তবে, বলি···

"আমার জীবনে পকেটমারের তিনটে গল্প বলি।

"আমি তখন পূর্বাশ্রমে। তরুণ বয়স। পারিবারিক ব্যবসায়ে জড়িত। অনবরত পূর্ণিয়া কাটিহার করে বেড়াই। সঙ্গে থাকে অনেক টাকা। একবার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি পঁচাত্তর হাজার টাকা। কী ভাবে নিই ? অনেক বুদ্ধি করে আমার সঙ্গের তোষকের মধ্যে সেলাই করে নিলাম নোটগুলি। শীতকাল। ট্রেনে ভিড় নেই। তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় তোষক পেতে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাইরে এমন একটা ভাব যে, আমার কোনও উদ্বেগ নেই। কামরায় এমন লোক দেখলাম না, যাকে সন্দেহ হতে পারে। যে দু-একজন সহযাত্রী ছিল, তারা শান্ত ভদ্র। সকালে জংশনে নেমে কাঁধে তোষক কম্বল চাপিয়ে বাসে উঠলাম। গদিতে পৌঁছলাম। বিনা ঝামেলায় পঁচাত্তর হাজার টাকা জমা দিলাম। সেখানেই হাতমুখ ধুয়ে জলপানি সেরে বেরোলাম।

"বেরিয়েই দেখি, ট্রেনের সহযাত্রী শিউপূজন। সোজাসুজি বলল, 'আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি। এদিকে আসুন, কথা আছে। আমি এ-লাইনের নামকরা পকেটমার। এই লাইনটাই আমার। আমার কাছে খবর ছিল, আপনি ৭৫ হাজার টাকা নিয়ে যাচ্ছেন। এই খবর আমি কিনেছি ২০ হাজার টাকায়। ট্রেনে সারা রাত আপনার সব কিছু হাতড়েছি, কিন্তু মাল পেলাম না। আপনি দয়া করে বলুন, কীভাবে টাকা আনলেন। আমি আপনাকে এখুনি ১০ হাজার টাকা দিচ্ছি।'

"বলে গেঁজে থেকে নোটের বাণ্ডিল খুলে টাকা বের করে দিল। হাতে নোট গুঁজে দিয়ে সে কী অনুরোধ উপরোধ ! 'দয়া করে বলুন। আমাকে যে খবর বেচল, সে কী আমায় বুদ্ধু বানাল ?'

"মহা মুশকিল ! শেষে পায়ে পড়ে গেল। তখন বলতেই হল, তোষকের ভিতরে সেলাই করে টাকা এনেছি। সেই মহা-পকেটমার তখন আমার হাতে দশ হাজার টাকা দিয়ে পদধূলি নিয়ে চলে গেল।"

গল্প শেষ করে মহারাজ হাসলেন। বিপিনবাবু চুপ করে রইলেন।

তখন মহারাজ শুরু করলেন দুসরা কিসসা।

"একদিন দুপুরে খিদিরপুর থেকে ট্রামে বালিগঞ্জ আসছি। ফার্স্ট ক্লাস। মোমিনপুর পর্যন্ত খুব ভিড় ছিল। পা-দানিতে একটা গাঁট্টাগোট্টা মানুষ দাঁড়িয়ে। তার পাশে হাতল ধরে কামরার ভিতরে এক বাঙালি ফুলবাবু। তিনি খুব বারফাট্টাই

নতুন ভোর হল নতুন রোদ উঠল

নতুন সানলাইট

ডিটারজেন্ট পাউডার

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

আপনিও আপনার ঘরে সানলাইটের ঝলমলানি আনুন। নতুন সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার ওজনে খুব হাল্কা, কিন্তু কাজ দেয় বেশি। দামী পাউডারের মত কাজ দেয়, অথচ দাম কম।

সানলাইটে একটি এমন উপাদান আছে, যা সাধারণ পাউডারে নেই। এটি কাপড়ের প্রতিটি তন্তু থেকে ময়লা বের করে দিয়ে তাতে চমক নিয়ে আসে।

সানলাইটে না হয় হাতের কষ্ট, না হয় কাপড়ের ক্ষতি। আর এর তাজা মনোরম সুগন্ধ আপনার কাপড়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে।

আপনিও আপনার জীবনে নিয়ে আসুন সানলাইটের চমক। একবার ব্যবহার করে দেখুন—মাত্র ৬ টাকা ৩৫ পয়সায়।

মাত্র
টা. ৬·৩৫
(স্থানীয় কর অতিরিক্ত)

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

OBM/2568 BEN

করছেন, 'হুঃ, অতই সোজা। পকেট মারলেই হল! অনেককেই দেখেছি। হাত ভেঙে দেব না?'

"পা-দানিতে দাঁড়ানো সেই গাঁট্টাগোট্টা জোয়ান বলল, 'বাবু, এ-সব কথা বলবেন না। চোর-পাকিটমার এখানে আছে কি না-আছে, তা আপনি জানেন? আপনি ধরতেই পারবেন না কীভাবে আপনার টাকা গেল। আপনার এই আদ্দির পাঞ্জাবির বুকপকেটে আপনি চারটে দশ টাকার নোট রেখেছেন। এত অসাবধান হয়ে চলাফেরা করেন! অপনার পকেটে আঙুল ঢুকিয়ে এইভাবে পাকিটমার আপনার টাকা নিয়ে নেবে—' বলেই বুকপকেটে আঙুল দিয়ে নোটগুলি তুলে নিয়ে এক লাফ দিয়ে চলন্ত ট্রাম থেকে লাফিয়েই ছুট লাগাল।

"হৈ-হৈ চিৎকার। রোককে···রোককে! ট্রাম থামতে থামতে মোমিনপুর এসে গেল। দশ-বারো জন নেমে দৌড়ল। পকেটমার ততক্ষণে উধাও। ওই দূরের গলিতে ঢুকে সে দৌড়ল, এক লহমা দেখা গেল। ব্যস্, আর তার টিকিও দেখা গেল না।"

গল্প শেষ করে মহারাজ আবার হাসলেন। বিপিনবাবু চুপ করে রইলেন। তখন মহারাজ শুরু করলেন তিসরা কিসসা।

"একদিন দোতলা স্টেটবাসে আসছি মানিকতলা থেকে। আটের-বি বাস। পকেটমারের জন্য কুখ্যাত। খুব ভিড়। আমি দোতলার সিঁড়িতে। উঠবার জন্য কোশিশ করছি। উঠতে পারছি না। সিঁড়ি আগলে দাঁড়িয়ে আছে দু-তিনটা লোক। বুঝলাম, এরাই পকেটমার। খানিক পরে টের পেলাম আমার গেরুয়ার ভিতর-পকেটে একজন হাত ঢুকিয়েছে। খপ করে হাতটা চেপে ধরলাম। খুব জোরে চেপে ধরলাম আর চেঁচিয়ে উঠলাম—'পকেটমার ধরেছি।' সঙ্গের লোক দুটো এক ধাক্কা দিয়ে তাদের সঙ্গীকে নামিয়ে নিয়ে যেতে চাইল। আমি ছাড়লাম না। আরও জোরে হাতটা চেপে ধরলাম। চিৎকার করলাম, 'কনডাকটার, রোকো, ইসকো হম্ ছোড়েঙ্গে নহিঁ।' মারলাম দুই ঘুসা। তারপর পকেটমারের হাতটা মুচড়ে ধরলাম। সঙ্গের দু'জন বেগতিক দেখে পালাল। পকেটমারের গলায় গামছা দিয়ে টেনে নামালাম। মারলাম আর দুই ঘুসা। ততক্ষণে পঞ্চাশজন লোক জুটে গেছে। 'মারুন মহারাজ, ব্যাটাকে মেরে শেষ করে দিন।' যে যেভাবে পারছে পকেটমারকে মারতে চেষ্টা করছে। তাদের থামিয়ে লোকটাকে নিয়ে গেলাম বড়বাজার থানায়।

"থানার বড়বাবু আমার পূর্বপরিচিত। বললেন, 'মহারাজ, আপনি বসুন। আমি এর ব্যবস্থা করছি।' তারপর হাঁকলেন, 'দরওয়াজা।' এল একজন। বললেন, 'দো আদমি ভেজো।'

"দুজন সাদা পোশাকের পুলিশ এল। তারাই পকেটমারকে ধোলাই দিল। সে যে কী ধোলাই, তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। বড়বাবু বললেন, 'মহারাজের গায়ে পকেটে আর কোনও দিন হাত দিবি না।' বলে পকেটমারকে হাজতে ঢুকিয়ে দিলেন।"

মহারাজের গল্প শেষ হল। এতক্ষণে বিপিনবাবুর মনের ভার নামল। মুখে হাসি দেখা দিল। মহারাজ বললেন, "আরতির সময় হয়েছে। চলুন, আরতি দেখবেন।"

সে-রাতে বিপিনবাবু শান্তচিত্তে বাড়ি ফিরেছিলেন।

ছবি : প্রবীর সেন

ডাক্তারবাবু বলছেন

ভিজব কি ভিজব না?

বর্ষাকালে বৃষ্টিতে ভিজব কি ভিজব না, এই প্রশ্ন সবাইকে ভাবিয়ে তোলে। বৃষ্টি দেখলে আমাদের ভিজতে লোভ হয়। কিন্তু মা-বাবা সাবধান করে বলেন, "খবরদার, বৃষ্টিতে ভিজো না, অসুখ করবে।" কী করা যায়?

প্রথম যে বৃষ্টি হয়, তাতে না ভেজাই ভাল। গ্রীষ্মকালে আকাশে-বাতাসে নানা রকমের জীবাণু, কলকারখানার ধোঁয়া কালি, মোটরগাড়ির পেট্রল, ডিজেলের এবং আরও নানা ক্ষতিকারক ধোঁয়া বাতাসে মিশে থাকে। প্রথম যেই বৃষ্টি হয়, এইসব বিষাক্ত পদার্থ বৃষ্টির জলের সঙ্গে আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এসে জলের সঙ্গে ধুয়ে যায়। তাই প্রথম বৃষ্টির জল গায়ে লাগলে এইসব বিষাক্ত পদার্থগুলো গায়ে লেগে যাবে, এবং নানারকম চর্মরোগ হবে। অন্য ধরনের রোগও হতে পারে। সেইজন্যে গ্রীষ্মের পরে প্রথম যে বৃষ্টি হয়, সে বৃষ্টিতে না ভেজাই ভাল।

স্কুল-কলেজ থেকে আসতে গিয়ে, অথবা খেলতে খেলতে যদি ভিজে যাও, কী করবে বলো? প্রথমে চেষ্টা করবে, গাছের তলায় দাঁড়িয়ে, অথবা কোনও বাড়ির বারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি এড়িয়ে যেতে। একান্তই যদি ভিজে যাও, তা হলে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাবে, ভেজা জামাকাপড়গুলো ছেড়ে, সাবান মেখে বাড়ির জলে ভালভাবে স্নান করে, খুব ভাল করে গা হাত পা মাথা ধুয়ে ফেলবে, যাতে গায়ে মাথায় কোথাও একটুও জল না থাকে। তারপর ভাল করে পাউডার মেখে শুকনো জামাকাপড় পরে ঘরে থাকবে।

এসব ছাড়াও প্রথম বৃষ্টির জলে ভিজতে নেই, কেন জানো? বৃষ্টির আগে গ্রীষ্মকালে বাইরের গরম খুব বেশি থাকে। তার সঙ্গে ঘামও হয়। তখন আমাদের শরীরের কোষগুলোও খুব গরম হয়ে থাকে। সেই গরম খানিকটা নিরসন করার জন্যেই আমরা ঘেমে থাকি, যাতে শরীরের ভেতরের আর বাইরের উত্তাপে একটা সামঞ্জস্য থাকে। হঠাৎ বাইরের আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে গেলে শরীরের কোষ তত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হতে পারে না, ফলে বাইরের গরমের সঙ্গে শরীরের ভেতরের গরম সামঞ্জস্য রাখতে পারে না, ফলে সর্দি, হাঁচি, কাসি, গা হাত পায়ে ব্যথা, গা ম্যাজম্যাজ করা, জ্বর হওয়া, এইসব উপসর্গ দেখা দেয়। সেইজন্যে বৃষ্টির জলে ভেজার পরে বাড়ির জলে স্নান করে নিলে শরীরের বাইরের উত্তাপের সঙ্গে, ভেতরের উত্তাপের অনেকটা সমতা এসে যায়, কারণ বৃষ্টির জল বরফ-গলা জল আর বাড়ির জল তার থেকে অনেক গরম।

তা বলে কি বৃষ্টির জলে ভিজব না?

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

পরদিন সকালে…
রিরিরিং
রিরিরিং
হেল্লো ?
যাচ্চলে ! এই অবস্থায় গিয়ে ফোন ধরতে হবে !
আসছি রে বাবা, আসছি !
রিরিরিং
রিরিরিং
রিরিরিং
হেল্লো…হেল্লো…কে ?… কী ?…কাকে চাই ?…ধুত, এটা রং নাম্বার !
ছপ
ছপ
ছপ
ছপ ঝপাং
রি রি রিং
কী রে বাবা, সবাই ঘুমুচ্ছে নাকি ?
সবাই ঘুমুচ্ছে !
হেল্লো !
হেল্লো ?…কে ?… জনসন ?… কী চাই ?
বিরক্ত করছি না তো ?
আরে, না না !
টিনটিনের সঙ্গে কথা বলতে চাও ?…কী দরকার ?…জেনারেল আলকাজারকে আমরা চিনি কি না ?…হ্যাঁ, কেন ?

লোহিত সাগরের হাঙর

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়

ক্রিটের দারুণ গরমে রোভার্সের খেলোয়াড়দের ঠাণ্ডা হবার সুযোগ এসেছে

রোভার্স বনাম ওল্ডফিল্ড। খেলা এখন ১-১। ওল্ডফিল্ড পরেছে হাল্কা ক্যাম্বিসের জুতো। ফলে তাদের গতি বেশি। প্রচণ্ড গরম। এখন একটু ঠাণ্ডা হওয়া দরকার ...

হোটেলের ওয়েটাররা বালতিতে কী আনছে ?

গোটা মাঠে ঘুরছে !

রয় বল বাড়িয়েছে !

এখন একটু ঠাণ্ডা হও সবাই !

কী বলছ রয় ? বালতিতে কী ?

বরফ-জল !

আরিব্বাস !

কী কাণ্ড !

দারুণ মজা !

অতঃপর মাঝে-মাঝেই চলল বরফ-জল ঢালার পালা !

দারুণ !

আরও দাও !

শাবাশ !

দাঁড়াও হে !

আমরা তো মাঠ ছাড়ছি না !

তা হলে আপনার আপত্তি হবে কেন ?

ঠাণ্ডা হয়ে রোভার্স ফিরে পাচ্ছে গতিবেগ ...

রোভার্সের গতিই এখন বেশি !

নাও, মার্ক !

মার্ক প্রাইস গোলে বল ঢুকিয়েছে !

গো-ও-ও-ল

বাচ্চাটা তো দারুণ খেলছে !

প্ল্যান খেটেছে !

ওল্ডফিল্ড এবারে বদলি খেলোয়াড় নামাবে !
ডেভ্ খোঁড়াচ্ছে ! উপায় কী !
ব্যাপার কী রয় ?
ক্যাম্বিসের জুতোর এটাই সমস্যা ! ফোশকা পড়েছে !
ওইজন্যেই আমাদের ও-জুতো পরতে দাওনি !
ওল্ডফিল্ডের অনেকের পায়েই ফোশকা !
আবার গোল দিয়েছে রয় !
থ্রি টু ওয়ান !
খেলা শেষ হবার আগে আবার গোল !
নতুন খেলোয়াড় অ্যালান লিঞ্চ !
রোভার্সের জুনিয়ারদের দাপটও কম নয় !
সরাসরি দুটি খেলায় জিতে ট্রোফি পেল রোভার্স ...
রয়ের জন্যে আলাদা ট্রোফি !
RAAAAAAAAY!
এবারে জারকাডির সঙ্গে প্রদর্শনী-খেলা !
হেরে মরব !
রোভার্স আমাদের ঘায়েল করবে !
সাইক্রো গ্রামে চলেছে রোভার্সের বিজয়োৎসব ..
ছুটির কটা দিন দারুণ কাটল !
এবারে ডিকটান গুহা দেখব !
সব হবে ! চিন্তা কোরো না !
হোটেলের ওয়েটার নিকোস হবে গাইড ...
পথটা নাকি গোলমেলে ?
আমি যখন গাইড, তখন আর চিন্তা কী ?
ওব্বাবা !
সত্যিই কি চিন্তার কিছু নেই ?
আমরা চ্যাম্পিয়ান !
এই ভ্রমণের স্মৃতি কি সত্যি সুখের হবে ?
কেন ? মস্ত কোনও বিপদ এবারে ঘটবে নাকি ?
এর পরে আগামী সংখ্যায়

অর্থ জানো

দাদুরি…অংস…

কবি হতে চাও ? তবে ছন্দে আর শব্দে তোমাকে নিপুণ হতে হবে। কবিতায় ছন্দ-স্রোত সঞ্চার করে শব্দ। তাই শব্দ চিনতে হবে, তার অর্থ জানতে হবে। নীচের সব শব্দই তো নানা কবির কবিতায় দেখতে পাও। প্রতিটি শব্দের কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে। শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে।

১। **দাদুরি**—(ক) ডাহুক, (খ) চাতক পাখি, (গ) ব্যাং, (ঘ) এক জাতীয় বর্ষার পাখি।

২। **অংস**—(ক) প্রাপ্য ভাগ, (, (খ) গ্রীবা, (গ) কাঁধ, (ঘ) পিঠ।

৩। **শিথান**—(ক) মাথা, (খ) বাহু, (গ) শিয়র, (ঘ) পাশ বালিশ।

৪। **প্রাকার**—(ক) দুর্গের সম্মুখভাগ, (খ) বেড়া, পাঁচিল, (গ) দুর্গের ছাদ, (ঘ) দুর্গের উপরের ছোট ঘর।

৫। **অঞ্জন**—(ক) চোখের রোগ, (খ) রং, (গ) ব্যক্তিবিশেষের নাম, (ঘ) কাজল।

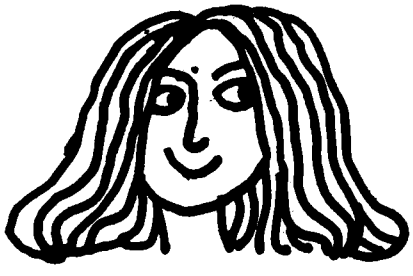

উত্তর ১। **দাদুরি**—(গ) ব্যাং। দাদুর শব্দটি সংস্কৃত দর্দুর শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ ব্যাং। তারই স্ত্রীলিঙ্গে দাদুরি। যেমন, 'কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত দাদুরি ডাকিছে সঘনে।' ২। **অংস**—(গ) কাঁধ। এটি সংস্কৃত শব্দ, বাংলাভাষায় কাঁধ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'বন্দুক সদর্পভরে, তুলি নিল অংসোপরে' (কবি নবীনচন্দ্র সেন)। ৩। **শিথান**—(গ) শিয়র। সংস্কৃত শিরঃস্থান শব্দ থেকে এসেছে। শিথান শব্দটি মাথার বালিশ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'মেঘের মতো গুচ্ছ কেশরাশি/শিথান ঢাকি পড়েছে ভারে ভারে' (রবীন্দ্রনাথ)। ৪। **প্রাকার**—(খ) বেড়া পাঁচিল। এই পাঁচিলে দুর্গ ঘেরা থাকে। যেমন, 'প্রাকারে চড়িয়া দেখিল চাহিয়া দক্ষিণে বহুদূরে' (রবীন্দ্রনাথ)। ৫। **অঞ্জন**—(ঘ) কাজল। এটি সংস্কৃত শব্দ। অন্‌জ কথার অর্থ দীপ্তি পাওয়া। অঞ্জন শব্দের মূল অর্থ যা দ্বারা চোখ দীপ্তিশালী হয়। বাংলাভাষায় এই শব্দ কাজল অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'নয়নে আমার সজল মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে' (রবীন্দ্রনাথ)।

দেব-সেনাপতি

সহজে ইংরেজি

বৃষ্টিতে ভেজা

সন্ধ্যা হতেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। চম্বল বাড়িতে নেই। এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছে, কী একটা বই আনতে।

And the downpour started within minutes of Chambal's leaving home.

"Was it so very important to get the book this afternoon?" Mr. Roy asked.

"He said it was," Mrs. Roy replied. "I tried to stop him from going. Anybody could see it was going to rain. But what do boys care?"

Mr. Roy said, "They wouldn't be boys if they did. That's not the way a grown-up would act. I sometimes wish I was a boy again. Then I could go out and get drenched in the rain without anybody thinking it odd."

"Oh, Daddy," Milly clapped her hands, and cried, "let's go out in the rain, shall we?"

"No, my dear," Mr. Roy replied, "I'm afraid I'd better not. This is one of the things you have to understand when you grow old. There are so many things you'd better not do."

"Why can't Daddy go out in the rain a little, Mummy?" Milly asked.

Mrs. Roy spoke quietly. "There are quite a few things you can't do, Milly. It's the same for me, and for everybody else. Let's try to find as much happiness as we can within the limits set for us."

"You can't do better, Milly," Mr. Roy said, " than to bear in mind what your mother has just said. Think of that little boy we saw the other day. He's only seven years old and he'll never be able to play football, or climb trees. Do you think he can never be happy? I'm sure he can. There are so many ways to happiness.

এ-বারে এই বাক্যগুলো লক্ষ করো

That's not the way a grown-up would act.
This is one of the things you have to understand.
There are quite a few things you can't do.
Think of that little boy we saw the other day.

ঠিক নিয়মমাফিক শুদ্ধ করে বলতে গেলে এই বাক্যগুলো এইরকম দাঁড়ায়

That's the way [in which] a grown-up would act.
This is one of the things [that] you have to understand.
There are quite a few things [that] you can't do.
Think of that little boy [whom] we saw the other day.

কিন্তু প্রথমে যে-ভাবে দেখিয়েছি, সেইটেই চলিত রীতি। সেই ভাবেই সবাই বলে।

প্রসাদ

গোলমাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : হরিবাবুকে একটা উটকো লোক জানায়, সে তার স্বর্গত পিতা শিবু হালদারের কাছ থেকে আসছে। সে নাকি উদ্ভট-বিজ্ঞানী শিবুবাবুর শাকরেদ ছিল। হরিবাবুর ছোট ভাই ন্যাড়া গজ-পালোয়ানের কাছে কুস্তি শেখে, আর-এক ভাই জরিবাবু শেখেন কালোয়াতি গান। উটকো লোকটা, আপাতত যার নাম পঞ্চানন্দ, দুজনকেই ভূতের ভয় দেখিয়েছে। হরিবাবুর দুই ছেলে ঘড়ি ও আংটির ক্রীড়া-দক্ষতা দেখে হাতরাশগড়ের মহারাজা তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যয় বহন করতে চান। সন্দিগ্ধ দুই ভাই গাড়ির মধ্যে তাঁকে ঘায়েল করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পালিয়ে তারা যে বাসে ওঠে, তার মধ্যে খুন হয় মহারাজার সেক্রেটারি। বাড়ি ফিরে তারা কাউকে কিছু জানায় না। গজ-পালোয়ানের আস্তানায় একটা লোক এসে ঢোকে, এবং ঢুকেই মারা যায়। হরিবাবুর কবিতা শোনাই এখন পঞ্চানন্দের চাকরি। জরিবাবুর ঘরের মেঝেয় তার শোবার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু মাঝরাতে আচমকা তার ঘুম ভেঙে যায়। তারপর···

অন্ধকারে পঞ্চানন্দ ঘুম ভেঙে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইল। তার ঘুম খুবই পাতলা। কিন্তু ঘুমটা ভাঙল কেন তা চট করে বুঝতে পারছিল না সে। কিছুক্ষণ কান খাড়া করে থাকার পর সে শুনতে পেল, কে যেন বাইরে থেকে খুব চাপা গলায় ডাকল, "ন্যাড়া ! এই ন্যাড়া !" ব্যাপারটা একটু দেখতে হচ্ছে। রাত-বিরেতে চাপা গলার ডাক মোটেই সুবিধের ব্যাপার নয়। কিছু গোলমাল আছে। আর যেখানে গোলমাল এবং গণ্ডগোল সেখানেই পঞ্চানন্দ জুত পায়।

কালো কম্বলটা মুড়ি দিয়ে উঠে পঞ্চানন্দ নিঃশব্দে দরজা খুলে ফেলল। তারপর বারান্দা ডিঙিয়ে, উঠোন পেরিয়ে বাইরের বাগানে এসে ন্যাড়ার ঘরের জানালার দিকে গুঁড়ি মেরে এগোল।

বেশিদূর এগোতে হল না। কুয়াশামাখা অন্ধকারে সে একজন লম্বামতো লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে টপ করে কামিনীঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিল।

লোকটা ডাকছে, "ন্যাড়া ! এই ন্যাড়া !"

ন্যাড়া কুস্তিগির বলেই বোধহয় ঘুমটা খুব গাঢ়। সাড়া দিচ্ছিল না। লোকটা খানিকক্ষণ ডাকাডাকির পর বন্ধ জানালার কপাটে টোকা দিতে লাগল।

ভিতর থেকে ন্যাড়ার ভয়জড়ানো গলা পাওয়া গেল, "কে ? কে ?"

লোকটা চাপা গলায় ধমক মারল, "চিৎকার কোরো না। আমি গজ-পালোয়ান। জানালাটা খোলো, জরুরি কথা আছে।"

সঙ্গে-সঙ্গে জানালা খুলে গেল। ন্যাড়া শিকের ফাঁকে উঁকি মেরে অবাক হয়ে বলল, "গজদা ! এত রাতে ? কী ব্যাপার ?"

গজ চাপা গলায় কী বলতে শুরু করল। পঞ্চানন্দ শুনতে না পেয়ে আরও একটু এগোল। বলতে গেলে গজ পালোয়ানের কোমরের হাতখানেকের মধ্যেই তার মাথা। মাঝখানে একটা শুধু কলাবতীর ঝোপ।

গজ বলল, "আমার বাড়িতে একটু আগে একটা লোক খুন হয়েছে।"

ন্যাড়া আঁতকে উঠে বলল, "সর্বনাশ !"

গজ বলল, "চেঁচিয়ো না, খুন হওয়ার ঘটনা আমি স্বচক্ষে দেখিনি। লোকটা রক্তমাখা শরীরে আমার ঘরে ঢুকেই পড়ে যায়। ঘাবড়ে গিয়ে আমি পালিয়ে আসি। কিন্তু কিছু দূর আসার পর আমার মনে হল, আগুপিছু ভাল করে না দেখে পালানোটা ঠিক হচ্ছে না। তখন আমি আবার ফিরে গেলাম। আশ্চর্যের ব্যাপার কী জানো ? গিয়ে দেখলাম খুন-হওয়া লোকটার চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। আরও দেখলাম, আমার জিনিসপত্র বলতে যা কিছু ছিল সব কে হাঁটকে মাটকে রেখে গেছে। তখন সন্দেহ হল, খুনটা হয়তো আসল খুন নয়। সাজানো ঘটনা। তাই বেরিয়ে যখন থানায় খবর দিতে যাচ্ছি তখন পানুর সঙ্গে দেখা। পানুকে চেনো তো ? তোমাদের সঙ্গেই কুস্তি শেখে ! তার মুখে আর এক আশ্চর্য ঘটনা শুনলাম। আজ একটা বাস-এ নাকি একটা লোক খুন হয়েছিল। লম্বা সুডুঙ্গে চেহারা। অবিকল আমার বাসার লোকটার মতো। খুন হওয়ার পর তাকে ধরাধরি করে সকলে হাসপাতালে নিয়ে দিয়ে আসে। হাসপাতালে তাকে ইমার্জেন্সিতে ফেলে রেখে ডাক্তাররা পুলিশে খবর দেয়। কিন্তু পুলিশ এসে দেখে ইমার্জেন্সির বেড খালি, লাশ নেই।"

"বলেন কী গজদা ? এ তো ভুতুড়ে কাণ্ড ?"

"হ্যাঁ। খুবই রহস্যময় ঘটনা। আমার মনে হচ্ছে দুটি ঘটনাই এক লোকের কাজ। দুবারই সে খুনের অভিনয় করেছে। কিন্তু তার কারণ কী সেটা জানা দরকার। তাই আমি ভাবছি কয়েকটা দিন তোমার এখানে একটু গা-ঢাকা দিয়ে থাকব। তোমার বাড়ির লোক জানলে ক্ষতি নেই, কিন্তু বাইরের লোক না যেন জানতে পারে।"

ন্যাড়া বলল, "কোনও চিন্তা নেই গজদা। আমার বাবার ল্যাবরেটরি তো পড়েই আছে। কেউ থাকে না। চলুন, এখনই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

গজ খুশি হয়ে বলল, "বাঃ, চমৎকার ব্যবস্থা।"

এই পর্যন্ত শুনে পঞ্চানন্দ সুট করে সরে এল। তারপর আড়ে-আড়ে থেকে নজর রাখল।

ন্যাড়া দরজা খুলে বেরিয়ে গজ-পালোয়ানকে খুব খাতির করে নিয়ে গিয়ে ল্যাবরেটরিতে ঢোকাল। ল্যাবরেটরির চাবি যে ন্যাড়ার কাছেই থাকে এটাও জেনে নিল পঞ্চানন্দ।

ল্যাবরেটরিতে শিবু হালদারের যা সব যন্ত্রপাতি ছিল তা আজও অক্ষত এবং যথাস্থানে সাজিয়ে রাখা আছে। কেউ নাড়াচাড়া করেনি। ল্যাবরেটরির একধারে একটা সিংগল খাটে বিছানা পাতা আছে আজও। কাজ করতে করতে রাত গভীর হয়ে গেলে শিবুবাবু এখানে শুয়ে থাকতেন।

ন্যাড়া বিছানাটা ঝেড়েঝুড়ে দিয়ে বলল, "গজদা, একটা কিন্তু সমস্যা আছে।"

"কী বলো তো ?"

ন্যাড়া মাথা চুলকে বলল, "বাবার ল্যাবরেটরিতে ভূত আছে।"

গজ চমকে উঠে বলে, "ভূত! তোমরা দেখেছ?"

ন্যাড়া মাথা নেড়ে বলল, "আমি নিজে দেখিনি। তবে অনেকে দেখেছে।"

"ভূতটার চেহারা কেমন?"

"সেইটেই তো গোলমেলে। একটা ভূত হলে একই রকম চেহারা হওয়ার কথা। কিন্তু এখানে নানা সময়ে নানাজনে নানারকম ভূতকে দেখে। বেঁটে ভূত, লম্বা ভূত, সাহেব ভূত, কাফ্রি ভূত। ভয়ে রাত-বিরেতে এদিকে কেউ আসে না।"

গজ একটু চিন্তিত হয়ে বলল, "ভূতের ভয় আমার নেই। তবে অনেকে যখন দেখেছে, তখন কিছু একটা আছেই। যাই হোক, আমি সাবধান থাকব।"

"দরজাটা ভাল করে এঁটে শোবেন।"

কাঁচের শার্শি দিয়ে পঞ্চানন্দ সবই মন দিয়ে দেখছিল আর শুনছিল। ভূতের কথাতে তার গায়ে একটু কাঁটা দিল।

ল্যাবরেটরির ভিতরে আলো থাকায় গজ-পালোয়ানকে খুব ভাল করে দেখে নিল পঞ্চানন্দ। চেহারাটা একই রকম আছে। গায়ের জোরও কি আর কমেছে? ওই হাতের রদ্দা যে কী বিভীষণ তা পঞ্চানন্দের মতো আর কে জানে?

ন্যাড়া বিদেয় হলে গজ ঘরের দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ বাঘের মতো পায়চারি করল। মাঝে-মাঝে কটমট করে চারদিকে চাইছে। একবার যেন পঞ্চানন্দের দিকেও চাইল।

বাইরে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। পঞ্চানন্দ জানে তাকে গজ পালোয়ান দেখতে পায়নি। তবু সে একটু পিছনে সরে একটা লেবুগাছের আড়ালে দাঁড়াল, চারদিকটায় একটু চোখ বুলিয়ে দেখে নিল। নাঃ, কোথাও কেউ নেই।

গজ পালোয়ান আরও কিছুক্ষণ পায়চারি করে থমকে দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ। তারপর এগিয়ে এসে ঘরের জানালাগুলোর পর্দা ভাল করে টেনে দিতে লাগল।

পর্দাগুলো ভীষণ মোটা কাপড়ের। তার ভিতর দিয়ে কিছুই দেখা যায় না। পঞ্চানন্দ জানালার ধারে গিয়ে অনেক উঁকিঝুঁকি দিল, কিন্তু সুবিধে হল না। তবে এটা সে বুঝল যে, ঘরে আলো জ্বেলে গজ কিছু একটা করছে। একটা দেরাজ খোলার শব্দ হল। কিছুক্ষণ পর একটা লোহার আলমারির পাল্লার শব্দও পাওয়া গেল।

গজ বন্ধ ঘরে কী করছে তা জানার অদম্য কৌতূহল সত্ত্বেও কিছু করার নেই জেনে পঞ্চানন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরের দিকে রওনা দেওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

আর তার পরেই তার মাথার চুলগুলো দাঁড়িয়ে পড়ার উপক্রম।

কেয়াঝোপটার নীচে ঘুটঘুট্টি ছায়ায় হঠাৎ একটু নড়াচড়া পড়ে গেল যেন। পঞ্চানন্দের চোখে অন্ধকার সয়ে যাওয়ায় একটু ঠাহর করে চাইতেই সে দেখতে পেল, তিনটে মানুষের চেহারার প্রেতমূর্তি কেয়াঝোপের অন্ধকার থেকে ধীরে-ধীরে বেরিয়ে আসছে।

পঞ্চানন্দ এমন হাঁ হয়ে গেল যে,নড়াচড়ার সাধ্য নেই। পা দুটো যেন পাথর। শরীরটা হিম। দাঁতে দাঁতে আপনা থেকেই ঠকঠক শব্দ হচ্ছে।

কিন্তু বহু ঘাটের জল খেয়ে পঞ্চানন্দ ঠেকে শিখেছে অনেক। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে টক করে ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে গেল। কম্বলের তলায় হাত-পা সব টেনে নিয়ে একেবারে মড়া হয়ে রইল সে। শুধু মুখের কাছটা একটু ফাঁক করে চোখ দুটো সজাগ রাখল।

আশ্চর্যের কথা, কেয়াঝোপের নীচে তিনটে সাহেবের লাশ পোঁতা আছে বলে সে নিজেই বলে বেড়িয়েছে। সেই তিনজন যে এমন জলজ্যান্ত হয়ে উঠবে তা জানত কোন্ আহাম্মক!

খুব আস্তে-আস্তে তিনটে মূর্তি ল্যাবরেটরির দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তিনজনেরই কালো রং। বেশ ঢ্যাঙা। শরীরও তাগড়াই। অন্ধকারে আর ভাল দেখা গেল না কিছু।

পঞ্চানন্দের বেশ কাছ ঘেঁষেই তিনটে মূর্তি ল্যাবরেটরির দিকে চলে গেল। পঞ্চানন্দ শ্বাস বন্ধ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে কুয়োর পাড় আর কলার ঝোপ পেরিয়ে সোজা জরিবাবুর ঘরে ঢুকে দরজা এঁটে দিল।

জরিবাবু অন্ধকারে কাতর গলায় বলে উঠলেন, "বাপ রে! গেছি!"

পঞ্চানন্দ ভড়কে গিয়ে 'আঁ আঁ' করে উঠল। তারপর সামলে নিয়ে একটা শ্বাস ফেলে বলল, "জেগে আছেন নাকি আজ্ঞে?"

জরিবাবু কাঁপা গলায় বললেন, "আপনি কে আজ্ঞে?"

"আজ্ঞে পঞ্চানন্দ।"

"এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?"

পঞ্চানন্দ সশব্দে একটা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "আর বলবেন না জরিবাবু, পাজিগুলোর সঙ্গে কি আর পারা যায়? আবার জ্বালাতে এসেছিল। তাড়া করে গিয়ে একেবারে গোয়ালঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছি।"

জরিবাবু উঠে বসে আলো জ্বালালেন। তারপর কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, "গোয়ালঘর থেকে তারা ফের বেরিয়ে পড়বে না তো! এতক্ষণ বড় জ্বালাতন করে গেছে।"

পঞ্চানন্দ আঁতকে উঠে বলল, "কে জ্বালাতন করে গেছে?"

জরিবাবু পানের বাটা টেনে কোলের ওপর নিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, "সে তো আপনি ভালই জানেন। ওই যে যাঁদের চোখে দেখা যায় না, অথচ আছে, তাঁরাই আর কি। তাও একজন নয়, দুজন নয়, তিন-তিনজন।"

"বলেন কী জরিবাবু! অ্যাঁ?"

"কেন আপনার সঙ্গে তাদের দেখা হয়নি?"

পঞ্চানন্দ কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, "হ্যাঁ, তা—তা হয়েছে বইকী। তবে কিনা···ইয়ে···।"

"আর বলবেন না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে শুনি ঘরে খুটখাট শব্দ। আমার ঘরে বাদ্যযন্ত্রের অভাব নেই। শুনি, পিড়িং করে তানপুরা বেজে ওঠে, টুস্ করে তবলায় শব্দ হয়, 'জ্যাঁ' করে হারমোনিয়ামের আওয়াজ ছাড়ে। ওফ্, কতক্ষণ যে দম চেপে শুয়ে ছিলাম।"

পঞ্চানন্দ তার বিছানাটা জরিবাবুর চৌকির ধারে টেনে এনে বলল, "আর ভয় নেই। আমি কাছাকাছি রইলাম। একটা জব্বর পান সাজুন তো।"

(ক্রমশ)

শয়তানের চোখ

সমরেশ মজুমদার

আগে যা ঘটেছে । সুপ্রকাশ চা-বাগানের কর্তা । ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর স্ত্রী কুমুদিনী সারা জীবনের মতো পঙ্গু । স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়ায় সায়ন এখন চা-বাগানেই আছে । বাংলোর হাতায় একজোড়া সাপ মারা হয়েছে । বুধুয়া-বুড়ো তাতে অখুশি । কাছেপিঠে ডাকাতি হচ্ছে । রাত্রে দূরের পাহাড়ে সাংকেতিক আগুন জ্বলে । সায়ন বুধুয়া-বুড়োর কাছে সংকেতের অর্থ জেনে নেয় । নদীর ধারে রহস্যময় কয়েকজন অশ্বারোহী দেখা যায় । তার আগে দেখা গিয়েছিল সওয়ারবিহীন একটা ঘোড়া । সায়ন তার পিঠে উঠতেই ঘোড়াটা ভুটানের পাহাড়ের দিকে ছুট লাগায় । তারপর···

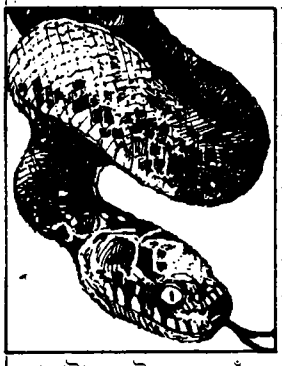

লাগাম দু'হাতে আঁকড়ে ধরেও বসে থাকতে পারছিল না সায়ন । ঘোড়াটা যেন পাগল হয়ে গিয়েছে । রেতি নদীর হাঁটুজল কয়েক লাফে ডিঙিয়ে সে নদীর বিশাল পাথুরে চরের ওপর দিয়ে ছুটে এল ভুটানের পাহাড়ি জঙ্গলের দিকে । এর মধ্যে কয়েকবার পড়তে-পড়তে বেঁচে গেছে সায়ন । দুই পায়ে ঘোড়াটার দুটো পাশ আঁকড়ে লাগাম শক্ত করে ধরে উবু হয়ে প্রায় ঝুলে ছিল সে । এই মুহূর্তে শুধু ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পাথরের ওপর পড়ে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া ছাড়া তার মনে অন্য কোনও ভয় কাজ করছিল না ।

তিনজন অশ্বারোহী যে-পথে ছুটে গিয়েছে এই ঘোড়াটি কিন্তু সেই পথ ধরেনি । বলা যায় প্রায় উল্টোদিক দিয়েই সে ভুটানের জঙ্গলে ঢুকল । পাহাড়ে ওঠার সময় তার গতি সামান্য কমলেও সায়নের পক্ষে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামা সম্ভব ছিল না । কিন্তু জঙ্গলে ঢোকার পর আর-এক সমস্যা দেখা দিল । বুনো গাছের ডালপালা ভেদ করে ছুটে যাওয়ার সময় সেগুলো যেমন ঘোড়াটার শরীরে আঘাত করছিল, তেমনি সায়নকেও ঘষটে দিচ্ছিল । সায়নের হাত কেটে রক্ত বের হতে লাগল ।

ব্যথা বোধহয় মানুষকে কিছুটা ধাতস্থ করে । সায়ন এবার প্রাণপণে চেষ্টা করছিল ঘোড়াটাকে দাঁড় করাতে । অকস্মাৎ যে ঘটনা ঘটেছিল, তার প্রাথমিক ধাক্কা এতক্ষণে যেন সামলে নিল সে । কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সে ঘোড়ার গতি স্থির করতে পারল না । এবং তখনই তার কান্না পেল । ক্রমশ তাদের বাংলো, চা-বাগান থেকে সে দূরে, অনেক দূরে চলে যাচ্ছে । এই ঘোড়া হয়তো শয়তানের নয়, কিন্তু সে একে বিন্দুমাত্র শাসন করতে পারছে না । ভুটানের পাহাড়ে তারা কোনও দিন আসেনি । ক্রমশ দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে । এখন এই ঘোড়া তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কে জানে ! হয়তো সে কোনও কালেই মা, বাবা, বুধুয়া-বুড়োকে দেখতে পাবে না । ব্যাপারটা ভাবতেই বুকের খাঁচা কাঁপিয়ে কান্না ছিটকে এল । কিন্তু ঘোড়াটার তাতে কোনও প্রতিক্রিয়া হল না । সে যেমন ছুটছিল, তেমনি ছুটে চলল ।

হঠাৎ ঘোড়া থমকে দাঁড়াল । যেন কান খাড়া করে কোনও শব্দ শুনতে চাইল । সায়নের মনে হল, এই সুযোগ । এখন যদি সে লাফিয়ে নেমে পড়ে, তা হলে কোনও রকমে ফিরে যেতে পারে । ঠিক তখনই অদ্ভুত একটা আওয়াজ কানে এল । খুব গম্ভীর এবং বেশি দূরে নয় । আওয়াজটা শোনামাত্র ঘোড়া হাঁটা শুরু করল । এবার তার গতি খুব সতর্ক, মেপে-মেপে এবং আওয়াজটা যেদিক থেকে এসেছিল তার বিপরীত দিকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছিল ঘোড়াটা । সায়ন বুঝল, ওই আওয়াজটাকে ভয় পেয়েছে ঘোড়া । এবং অমন শব্দ কোনও মানুষ স্বাভাবিক গলায় করতে পারে না । ঘোড়াটা সরতে-সরতে একটা বিশাল শালগাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ানো মাত্র শব্দটা ছিটকে এল । কোনওরকমে ঘোড়ার ঘাড়ের উপর থেকে মুখ তুলে সায়ন ডাইনে-বাঁয়ে তাকাতেই চমকে উঠল । অত বড় সাপ যে পৃথিবীতে আছে, তা-ই ভাবা যায় না । সাপটার মুখ হাঁ, এবং তাতে প্রমাণ সাইজের একটা হরিণ অর্ধেক ঢুকে আটকে আছে । কারণ, হরিণের শিং সাপের চোয়ালের ভাঁজে বিঁধে যাওয়ায় পুরো শরীরটা পেটের ভেতর ঢুকছে না । আর সেটাকে গিলবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে সাপটা । অন্তত পনেরো ফুট লম্বা বিশাল শরীরটা স্থির, শুধু মুখ হরিণটাকে নিয়ে ওপরের দিকে উঁচিয়ে, গলার কাছে থরথর কাঁপুনি । এবং গলাধঃকরণে অসুবিধে হচ্ছে বলে সাপটার শরীর থেকে এমন একটা অতৃপ্তি বা আপত্তির নিশ্বাস বেরিয়ে আসছিল, যা হরিণের শরীরে বাধা পেয়ে বিকট গর্জনের চেহারা নিচ্ছে । সাপের গর্জনের কথা এর আগে সায়ন শুনেছে । কিন্তু একে কি গর্জন বলে ? আক্রোশ ও অতৃপ্তি থেকে ওই শব্দটা জন্ম নিচ্ছে । বিশ্বচরাচরে কোথায় কী হচ্ছে সে-দিকে সাপটার কোনও হুঁশ নেই । এবং তার পরেই যে দৃশ্যটা সায়ন দেখল, তাতে তার শরীর হিম হয়ে যাবার অবস্থায় চলে এল । বিশাল ওই সাপের রাগের কারণ এতক্ষণে খুঁজে পেল সায়ন । সাপের মুখের বাইরে হরিণের যে অংশ বেরিয়ে আছে, সেই অংশের আড়াল থেকে সরে এল একটা চতুষ্পদ জন্তু । ওটা নেকড়ে কিংবা শিয়াল নয়, তার চেয়ে বীভৎস দেখতে । তক্ষুনি নামটা মনে পড়ল সায়নের । হায়েনা । একটা নয়, দুটো । খুবলে-খুবলে ওরা হরিণটার শরীর থেকে মাংস বের করে মজাসে খাচ্ছে । যেন সাপটা কাঁটা-চামচে মাংসের একটা টুকরো ধরে রেখেছে, আর ওরা তা থেকে পছন্দমতো গ্রাস নিচ্ছে । এতে সাপের রাগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক । সে চাইছে দ্রুত হরিণটাকে গিলে ফেলতে । মাংসের ভাগ ফোকটে হায়েনাগুলো নিচ্ছে, এতেই সে ক্রুদ্ধ । কিন্তু হরিণের বিশাল চেহারা এবং তার চেয়ে বিশাল শিংজোড়া বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

হঠাৎ একটা হায়েনা সতর্ক হয়ে উঠল । তার চোখ তীব্র দৃষ্টিতে এদিকের জঙ্গলে সন্দেহজনক কিছু খুঁজল । ঘোড়াটা বুঝতে পেরেছিল, সাপটার কাছ থেকে তার কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই । কিন্তু নতুন বিপদ তৈরি হতে যাচ্ছে । সে আর

আমাদের কোচ বলেছেন
দম বাড়াবার জন্যে পুষ্টি দরকার।
দুধ, মল্টেড বার্লি-এইসব। তাই উনি
রোজ প্র্যাকটিসের আগে নিজের
হাতে আমাদের হরলিক্স খাওয়ান।
হরলিক্স ঘন দুধ, মাল্টেড বার্লি
আর সোনালী গমের দানার পুষ্টিগুণে
ভরা একটি সুস্বাদু পানীয়।
১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে,
পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি পরিবারে
পুষ্টি যুগিয়ে আসছে।
Horlicks
The Great Nourisher
নতুন যুগের
নতুন রূপে
পুষ্টি যোগাতে অদ্বিতীয়
HTD-HMM-8074 BEN

দাঁড়াল না। তীব্র গতিতে জায়গাটা ছেড়ে এগিয়ে চলল সামনে। সঙ্গে-সঙ্গে লাগাম ধরে ঘোড়ার পিঠের ওপর শরীর মিশিয়ে শুয়ে পড়ল সায়ন। এর মধ্যে যে-দুটো জন্তু তার চোখে পড়েছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে, এই জঙ্গলের মধ্যে হেঁটে যাওয়ার চেয়ে ঘোড়ার পিঠটা অনেক বেশি নিরাপদ। এবং হঠাৎই তার খেয়াল হল, সাপটাকে দেখার পর তার সেই কান্নাটা থেমে গেছে।

এই পাহাড় আর জঙ্গলে বিপদ থিকথিক করছে। ওই বিশাল সাপ কিংবা হায়েনা ছাড়াও নিশ্চয়ই আরও ভীষণ-ভীষণ সব হিংস্র প্রাণী এখানে ঘুরে বেড়ায়। অতএব বাড়ির জন্যে এখন না কেঁদে কোনও রকমে প্রাণটাকে বাঁচানোই বুদ্ধিমানের কাজ। আর সেটা করতে গেলে এই ঘোড়ার পিঠ থেকে নামা চলবে না।

ক্রমশ সন্ধে হয়ে এল। জঙ্গলে অন্ধকার নামে হুড়মুড়িয়ে। জানান দেবার সঙ্গে-সঙ্গে চতুর্দিক অন্ধকার। কিন্তু আজ সন্ধের আঁধারের সঙ্গে আর একটা আলোর মিশেল দেখা দিল। ফিনফিনে চাঁদ মরা বিকেলে উঁকি মারলে এইরকম আলো আকাশে ছড়ায়। সায়নের অবশ্য আকাশের দিকে তাকাবার অবস্থা ছিল না। ঘোড়ার পিঠের আশ্রয় সে আর ছাড়তে রাজি নয়। বিশ্বচরাচরের কোনও দিকে তার নজর নেই।

এই ঘোড়ার মুখে যখন লাগাম আঁটা, তখন এটি পোষা জীব। এই পোষা প্রাণীটির সন্ধানেই কি ওই তিন বিকট মানুষ এসেছিল ? ওদেরই ভয়ে এই ঘোড়া পেছনে ধুলোর ঝড় তুলে চা-বাগানের মধ্যে ছুটে গিয়েছিল ? কেন ? এই ঘোড়া কি ওই তিনজনের পোষা প্রাণী নয় ?

হঠাৎ ছলাত-ছলাত শব্দ কানে আসতে সায়ন মুখ তুলল। অদ্ভুত এক আঁধার নেমেছে পৃথিবীতে। মাথার ওপর আকাশটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। কানে তালা ধরিয়ে ঝিঁঝিরা যে বাজনা বাজাচ্ছিল, তার আওয়াজ বাড়ছে কমছে। ঠিক তাল এবং ছন্দ রেখে। আর তারই মধ্যে ভেসে আসছে জলধারার শব্দ। এতক্ষণে ঘোড়াটাকে স্বাভাবিক এবং নিশ্চিন্ত বলে মনে হল। সে যেন চিনে-চিনে ঠিক জায়গায় এসে গিয়েছে। টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে ঘোড়াটা যেন পরিস্থিতি জরিপ করছে। সায়ন অনুভব করছিল, তার উপস্থিতিকে ঘোড়াটা যেন পৃথক ভাবে নিচ্ছে না। সে যেন ঘোড়াটার শরীরের অংশ হয়ে গিয়েছে। এবার এক-পা দু'-পা করে ঘোড়া এগোতে লাগল। সায়ন এতক্ষণে মনে-মনে পরিকল্পনা স্থির করে নিয়েছে।

ঘোড়াটা নিশ্চয়ই একটা মানুষের কাছেই ফিরে যাচ্ছে। সে দূর থেকে লক্ষ করবে, মানুষটি কেমন। ভাল বুঝলে কাছে গিয়ে সব কথা বলে মিনতি করবে তাকে চা-বাগানে পৌঁছে দেবার জন্যে। আর যদি মনে হয় মানুষটা খুব বদ-টাইপের, তাহলে চুপিচুপি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে কোনও গাছের ডালে উঠে রাতটা কাটিয়ে দেবে। কাল সকাল হলে এই পথ ধরে ফিরে যাবে সে চা-বাগানে, একাই। মুশকিল হবে এই, কতটা রাস্তা কীভাবে কোন্ ফাঁক গলে আসা হল, তার হিসেব মনে নেই। তবু দিনের বেলায় সে নিশ্চয়ই চিনতে পারবে। এর মধ্যে সে ঘোড়াটার কিছু কায়দা-কানুন শিখে ফেলেছে। কাঁধে চাপ দিলে ঘোড়া গতি কমিয়ে দেয়। কাঁধে চাপ ও লাগাম টানা একসঙ্গে হলে সে দাঁড়াবেই। দুই-গোড়ালি দিয়ে

পেটে লাথি মারলে সে গতি বাড়াবে। এসব শেখা হল, কিন্তু ঘোড়াটা এমন বেয়াদপ যে, সায়ন ডাইনে-বাঁয়ে লাগাম টানলেও সে মুখ ফেরাচ্ছে না। যে-দিকে যাবার সে-দিকেই যাচ্ছে। তা ছাড়া ঘোড়ার উদোম পিঠে বসা যে কী কষ্টকর, তা এর মধ্যে হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছিল সায়ন। সমস্ত শরীরে ব্যথা, তাই ঘোড়া নিয়ে নতুন কায়দা শেখার ইচ্ছেটাও হচ্ছিল না।

একটা ঢালু পথে নামতে গিয়েই ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে পড়ল। শব্দ হচ্ছে। জলের শব্দের সঙ্গে গাছ ভাঙার শব্দ। মড়মড় করে ডাল ভাঙছে কাছেই। মশারির মতো অন্ধকারে কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। ঘোড়াটা যখন দাঁড়াল, তখন এ নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছে। খুব নিঃশব্দে ঘোড়াটা একটা বড় পাথরের গা ঘেঁষে দাঁড়াল, যাতে চট করে তাকে দেখা না যায়। বলা যায়, পাথরের সঙ্গে মিশেই রইল সে। ফলে সায়নের বাঁ পায়ে ভীষণ চাপ লাগছিল পাথরের। ওর মনে হচ্ছিল এইবার মচ্ করে পা ভেঙে যাবে। কিন্তু এখন চিৎকার করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, কারণ সামনে বিপদ না বুঝলে ঘোড়া এমন করত না। ঠিক সেই সময়ে ডাক শুনতে পেল সে। সমস্ত শরীর থরথরিয়ে উঠল তার। একেই বোধহয় বৃংহণ বলে। কোনও রকমে মুখ তুলে সায়ন দেখল পাহাড়ের ওপর সচল পাহাড় ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা একটা করে দশটা চেহারা দেখল সে। কোনও দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। মেজাজে গাছের ডাল ভাঙছে। হাতি অনেক দেখেছে সায়ন। কিন্তু এমন বিশাল চেহারার হাতি সে কখনও দেখেনি। যেমন লম্বা, তেমন কালো। সুপ্রকাশ তাকে হাতিদের গল্প শোনাতেন। পৃথিবীর এক-এক অংশে হাতিদের চেহারা এক-এক রকম। তবে তরাই অঞ্চলে যে-সব হাতি জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, তারা মূলত আসে ওপাশে বার্মা আর এপাশে নেপালের জঙ্গল থেকে। কিন্তু সব পাহাড়ি হাতি তরাইয়ের নিচু অঞ্চলে নামে না। যাদের খিদে মেটে না, জঙ্গলে কিংবা মানুষের চাষ করা ফসলে যাদের রুচি এসেছে, সেইসব হাতি ভুট্টা বা গমের সময় দলে-দলে নেমে আসে পাহাড় ছেড়ে। কিন্তু তাদের চেহারা এত বিরাট নয়। ঘোড়াটা হাতিগুলোকে খুব ভয় পেয়েছে, এটা বোঝা যাচ্ছিল। এবং আর-একটা মজার কাণ্ড, ঝিঁঝির ডাক থেমে গিয়েছে হাতিদের অস্তিত্ব জানাজানি হবার সঙ্গে-সঙ্গেই। মনে হচ্ছিল, এই জঙ্গলে হাতি ছাড়া আর কোনও জন্তু বাস করে না। আর কারও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না।

ঠিক সেইসময় ঘোড়াটার নাক বিকট অথচ চাপা শব্দ করে উঠল। এতক্ষণ যে ছিল ভয়ে সিঁটিয়ে, সে খামোকা অমন শব্দ করতে যাবে কেন? সায়ন মুখ বাড়িয়ে দেখতে চাইল। ঘোড়াটা তখন দু'পা পিছিয়ে এসেছে। আর তখনই সায়নের মনে হল, তার বাঁ পাটা নেই। অসহ্য যন্ত্রণা হাঁটু আর গোড়ালির মধ্যে পাক খেতে লাগল। ঘোড়াটা পিছু সরাতে পাথরের সঙ্গে যে ঘষ্টানি হল, তাতে সে চোখে সরষে ফুল দেখা সত্ত্বেও একটা শিশু-হাতির অস্তিত্ব টের পেল। হাতিটা খুবই বাচ্চা। লম্বায় এখনও ঘোড়াটার নীচে। টলটলে পায়ে শুঁড় বাড়িয়ে ঘোড়ার মুখে আদরের ছোঁয়া দিতে চাইছে। আর যত সে ওরকম করছে, তত পিছিয়ে যাচ্ছে ঘোড়াটা অন্ধের মতন। শিশু-হাতিটা নিশ্চয়ই দল থেকে বেরিয়ে এসেছে কাউকে না জানিয়ে। যেই ওর খবর নেবে ওরা, অমনি ঘোড়া ও মানুষের অস্তিত্ব টের পেয়ে যাবে। তখন কী হবে কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

সেই অবস্থায় যতটুকু জোরে সম্ভব সায়ন ঘোড়াটার দুদিকে চাপ দিতেই যেন সম্বিত ফিরে এল; পলকেই লাফাল ঘোড়াটা, তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্ধকারে ঢালু পথ বেয়ে নীচের দিকে নামতে শুরু করল। এর মধ্যে হাতির দলে সাড়া পড়ে গিয়েছে, দলের মধ্যে কেউ বিপদে পড়েছে ভেবে তারা ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। বাঁ পায়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণা সত্ত্বেও সায়ন বুঝতে পারছিল, জঙ্গল ভেঙে কেউ ছুটে আসছে পিছু-পিছু হুড়মুড়িয়ে।

ঠিক তখনই ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে পড়ল। এখন জলের শব্দ আরও স্পষ্ট। পেছনের শব্দটা আরও এগিয়ে আসছে। খুব শান্ত ভঙ্গিতে ঘোড়াটা জলে নামল। নদীতে স্রোত খুব, না হলে ঘোড়ার পায়ে জল আঘাত পেয়ে ছিটকে ওপরে উঠত না। ঘোড়াটা খুব সতর্ক হয়ে এগোচ্ছিল। ক্রমশ জল বাড়তে লাগল। সায়নের জখম হওয়া পা কনকনে জলে ডুবে গেল। অন্য পায়েরও সেই অবস্থা। স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে ঘোড়াটা। পেছনের ছুটে আসা শব্দটা এখন থেমে গেছে। আকাশে হালকা চাঁদ। জলে চকচকে ঢেউ। এই মোলায়েম আলোয় সায়ন দেখল নদীটা বিশাল নয়। এত বড় পাহাড়ের বুকে খুব বিশাল নদী থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু স্রোত খুব। আর ঘোড়াটা প্রাণপণে চেষ্টা করছে স্রোতকে সঙ্গী করে ওপারে পৌঁছাতে।

হঠাৎ দূরে জলের মধ্যে তোলপাড় শুরু হল। আর সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল ঘোড়াটা। মরিয়া হয়ে সে ছুটে চলল ওপারের দিকে। সায়নের বাঁ পা এতক্ষণ অবশ ছিল। এখন একটা প্রচণ্ড যন্ত্রণা পাক খেয়ে উপরের দিকে উঠে আসছিল। ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল ওর কছে। অথচ দূরের তোলপাড়-করা জলের শব্দটা ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে। ঘোড়াটাও বুঝতে পেরেছে বিপদ খুবই কাছে। সায়নের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। মাথার ভেতরটা শূন্য। কোনও বোধ বা বুদ্ধি তার কাজ করছিল না। শুধু তার দুটো হাতের মুঠো লাগাম ছাড়ছিল না এতক্ষণের অভ্যাসে।

এইসময় ঘোড়াটা প্রচণ্ড চিৎকার করে মরিয়া হয়ে লাফ দিল শূন্যে। নদীর অন্যপাড় যে কাছে এসে গেছে, তা জেনেছিল ঘোড়াটা। কিন্তু সে লাফানো মাত্র সায়নের হাতের মুঠো থেকে লাগামটা খসে গেল। ঘোড়ার পিঠ থেকে তার শরীর শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হল। এবং ক্রমশ চেতনাহীন নেমে এল লম্বা ঘাসের জঙ্গলে। (ক্রমশ)

ছবি অনুপ রায়

ইংরেজি সাহিত্যের ডঃ জনসন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে ছাড়তেন না; অথচ তিনি নিজেই হয়ে পড়েছিলেন কুসংস্কারের শিকার। বৈকালিক ভ্রমণে বেরোলে জনসন রাস্তার ধারের প্রতিটি ল্যাম্পপোস্ট ছুঁতে-ছুঁতে যেতেন, দৈবাৎ যদি একটায় হাত দিতে ভুলে যেতেন তো সঙ্গে-সঙ্গে বাড়িমুখো।

হাতি, গণ্ডার, জিরাফ

সুজিতকুমার নাহা

হাতি, জলহস্তী আর উট একদম লাফাতে পারে না। কিন্তু, যেমন জলহস্তী তেমনি হাতিও সাঁতার কাটতে পারে দারুণ। যারা বলে, জলহস্তীদের রক্ত-ঘর্ম হয়, তারা ভুল বলে। গণ্ডারের শিঙে হাড় নেই। আর জিরাফ ? তার হৃৎপিণ্ডের দৈর্ঘ্য কত বলো তো ? ৬০ সেন্টিমিটার। জিরাফ-শিশু যে শিং নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়, এই খবরটাই কি তোমরা জানতে ?

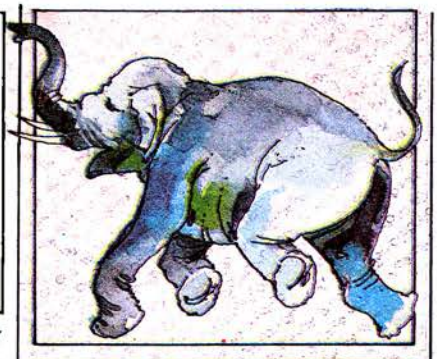

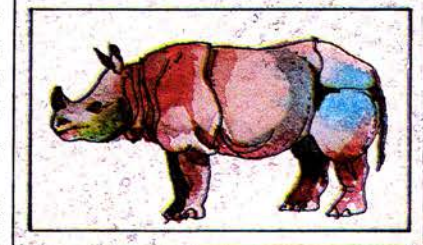

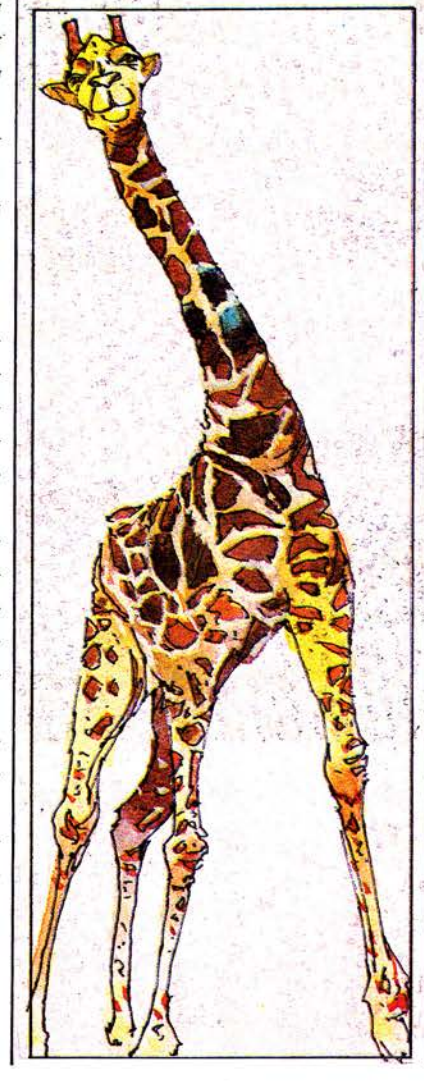

হাতিরা যদি নিজেদের মধ্যে অলিম্পিক-গোছের কোনও খেলাধুলোর আয়োজন করে, তবে হাইজাম্প বা লংজাম্পের 'ইভেন্ট' অবশ্যই থাকবে না সেই অলিম্পিকে! আসলে, হাতিরা একেবারেই লাফাতে পারে না। লাফাতে হলে পায়ে যে-সব পেশী থাকা দরকার, বেচারাদের সেগুলো মোটেই নেই। কাজেই চলার পথে একটা অপ্রশস্ত নালা সামনে পড়লেও হাতিরা সেটি লাফিয়ে ডিঙোতে পারে না, নালায় নেমে হেঁটে হেঁটে পার হয়।

জলহস্তী এবং উট কতটা লাফাতে পারে ? মাথা চুলকোবার দরকার নেই, উত্তরটা বলেই দিচ্ছি। হাতি যতটা লাফ দিতে পারে, এরাও পারে ঠিক ততটাই, অর্থাৎ এক সেন্টিমিটারও নয়!

লাফালাফির ব্যাপারে গোল্লা পেলেও হাতি কিন্তু বেশ ভাল সাঁতারু। তবে সাঁতারের ব্যাপারে রীতিমতো পারদর্শী হচ্ছে জলহস্তী। চেহারায় অমন গাট্টাগোট্টা হলে কী হবে, জলহস্তী সাঁতার কেটে এগিয়ে চলতে পারে প্রায় মাছেদের মতো দ্রুতগতিতে। সত্যি বলতে কী, জলহস্তী-শিশু হাঁটতে শেখার আগেই শেখে সাঁতার কাটতে, কারণ ওদের জন্ম হয় জলের ভেতরেই। অনেক সময় জলের ভেতর দিয়ে সাঁতার না-কেটে নদীগর্ভের মাটির ওপর স্রেফ হেঁটে হেঁটে জলহস্তী দিব্যি এগিয়ে চলে।

জলহস্তীদের চামড়ায় এক বিশেষ ধরনের গ্রন্থি আছে যা থেকে গোলাপি রঙের একটা তৈলাক্ত পদার্থ নির্গত হয়। এই তৈলাক্ত পদার্থের ওপর আলো পড়ে দেখায় রক্তের মতো লাল। এই কারণে আগে একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে, জলহস্তীদের রক্ত-ঘর্ম হয়। বলা বাহুল্য, ধারণাটা ঠিক নয়।

ওজনের দিক দিয়ে বিচার করলে স্থলচর জন্তুদের মধ্যে হাতিই যে হবে প্রথম, সে-কথা সকলেরই জানা। কিন্তু যদি প্রশ্ন করি দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর নাম কী, তবে অনেকেই হয়তো জবাব দিতে পারবে না। যাই হোক, উত্তরটা জানিয়ে দিচ্ছি। এই জন্তুটি হচ্ছে আফ্রিকার চৌকো-ঠোঁট (square-lipped) গণ্ডার। এদের ওজন ৩৬০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। ভারতীয় গণ্ডারের তো সবেধন-নীলমণি একটিই খড়্গ। আফ্রিকার গণ্ডারদের খড়্গের সংখ্যা কিন্তু দুটি। আশ্চর্যের কথা, গণ্ডারের খড়্গে অস্থি নেই মোটেই। কেশ-জাতীয় তন্তু একসাথে জুড়ে শক্ত হয়ে এটির সৃষ্টি হয়। কোনও কারণে খড়্গ ভেঙে গেলে আবার গজায়।

দেখতে ভয়ংকর হলে কী হবে, গণ্ডার কিন্তু সহজেই পোষ মানে। বিগত শতাব্দীতে যখন আসামে গণ্ডারের সংখ্যা ছিল প্রচুর, তখন অনেক সময় লাঙল দেওয়ার কাজেও গণ্ডার লাগানো হত। মাত্র একশো বছর আগেও গুয়াহাটির রাস্তায় দেখা যেত কাপড়ের বোঁচকা নিয়ে হেলতে-দুলতে চলেছে একটি গণ্ডার!

গণ্ডারের চামড়া খুবই মোটা। শোনা যায়, কয়েকশো বছর আগে অনেক রাজা-রাজড়ার সেনাদলেই থাকত একটি গণ্ডার-বাহিনী। চলমান বর্মের মতোই এই গণ্ডারেরা সৈন্যদের আড়াল করে রাখত প্রতিপক্ষের নিক্ষিপ্ত বর্শা ও তীরের থেকে।

গণ্ডারের পর আসা যাক জিরাফের কথায়। জিরাফ পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু প্রাণী। এদের উচ্চতা সাড়ে পাঁচ মিটার পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। জিরাফের ঘাড় আশ্চর্যরকমের লম্বা। মজার কথা, মানুষের ঘাড়ে আছে যে-কটি হাড়, জিরাফের ঘাড়েও আছে ঠিক সে-কটি হাড়ই (অর্থাৎ, সাতটি)। তবে জিরাফের ঘাড়ের প্রত্যেকটি হাড়ই আকারে প্রকাণ্ড লম্বা।

জিরাফের হৃৎপিণ্ডটিও বেজায় লম্বা— প্রায় ৬০ সেন্টিমিটার। অর্থাৎ একটি নবজাত মানব-শিশুর দৈর্ঘ্যের থেকে জিরাফের হৃৎপিণ্ড বেশি লম্বা।

জিরাফের ব্যাপারে আরও একটি মজার খবর দিয়ে এই লেখাটি শেষ করব। অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণীরই মাথায় আছে শিং। উদাহরণ হিসেবে নাম করতে পারি ছাগল, গোরু, মোষ, বাইসন ইত্যাদি প্রাণীর। এদের কারও কিন্তু শিশু-অবস্থায় শিং থাকে না, বয়েস বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে শিং গজাতে থাকে। এই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম জিরাফ। জিরাফ-শিশু শিং নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়!

আমার মেয়ে এই শৈশব পার হল । মা হয়ে আমি বুঝি ওর পক্ষে এই সময়টা কত অস্বস্তিকর হতে পারে ।

"আমার মেয়ের জন্য কেন কেয়ারফ্রী বেছে নিলাম"

মা মাত্রেই জানেন, মেয়েদের সেই বয়সটা কীভাবে কাটে—যখন শৈশব ছাড়িয়ে সবে কৈশোরে পা দিচ্ছে । সেই অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তার দিনগুলি ।

মা হয়ে আমি মেয়ের অবস্থা ভালভাবেই বুঝি । আমিও তো একদিন ওই বয়সেরই ছিলাম ! আমি তো জানি মাসের ওই ক'টা দিন কত অসুবিধা আর অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটে ।

এতদিন আমি ঘরোয়া ন্যাপকিনেই কাজ চালিয়ে এসেছি—কিন্তু তার কাচাকুচি বড় সঙ্কোচের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় ।

এতদিন আমি ঘরোয়া ন্যাপকিনেই কাজ চালিয়ে এসেছি—তবে তার কাচাকুচি বড় সঙ্কোচের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় ।

তাতে আব্রু বলতে কিছু থাকে না । যেমন তাতে অসুবিধা, তেমনি অস্বস্তি । আর তাতে পুরোপুরি

নির্ভরতা তো পাওয়াই যায় না—তার উপর আবার কখন কী ঘটে যাবে, সবসময় সেই ভয় ।

অবশ্য এখন আমি ঘরোয়া ন্যাপকিনেই অভ্যস্ত । তা ছাড়া, আমাদের সময়ে এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ ছিল না—কারণ ওই ক'টা দিন বাইরে বেরুনো ছিল একদম মানা ।

তবে দিন পাল্টাচ্ছে তো !···এখন মেয়েদের তো ওই ক'টা দিনেও কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকতে হয় ।

তবে দিন পাল্টাচ্ছে তো ! কেয়ারফ্রীর সুরক্ষা যখন হাতের কাছেই মজুত, তখন আমার মেয়ে কেন আমার মতোই বোঝা বইবে ? ওর যুগ এখন আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে গেছে । এখন মেয়েদের তো ওই ক'টা দিনেও হরেক কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় । আমার মেয়ের কথাই ধরুন না—আমার সে-বয়সের তুলনায় ওকে সামাল দিতে হয় ঢের বেশি—যেমন পড়াশোনায়, তেমনি অন্য ব্যাপারেও । সবচেয়ে বড় কথা, আমি চাই যে, ও আমাদের মতো ঘরে বসে না-থেকে জীবনটাকে পুরোপুরি উপভোগ করুক ।

এই কারণেই তো আমি আমার মেয়ের জন্য কেয়ারফ্রী বেছে নিলাম । যাতে ও সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে—যা-ই করুক না কেন । আর এ-বিষয়ে কেয়ারফ্রীর আশ্বাস আর কেই বা দিতে পারে ।

জানেন নিশ্চয়, কেয়ারফ্রী হল রেডিমেড ন্যাপকিন—যার ফলে এটা ব্যবহার করা আর বদলানো খুবই সহজ । মা হিসাবে আমার কাছে আরও বড় কথা এই যে, কেয়ারফ্রী হল পুরোপুরি স্বাস্থ্যসম্মত ।

কেয়ারফ্রী ব্যবহার করে আমার মেয়ে যাবতীয় বিড়ম্বনা, অসুবিধা আর অস্বস্তির হাত থেকে রেহাই পায় । যখন দরকার, তখনই নিয়ে নেয় একটা আনকোরা নতুন ন্যাপকিন ।

সত্যি কথা বলতে কী, এই রেডিমেড ন্যাপকিন কতটা কাজের হবে, সে-বিষয়ে আমার নিজেরই কিছুটা সংশয় ছিল । কিন্তু আমার মেয়ে তো বেশ কিছুদিন হল এটা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করছে । সে বলে যে, কেয়ারফ্রী ব্যবহার করে সে অনেক বেশি নিশ্চিন্ত আর নিরাপদ বোধ করে—এমনকি বাড়ির বাইরেও । কাজেই ওকে নিয়ে এ-ব্যাপারে অন্তত আমার আর কোনও ভাবনা নেই ।

কেয়ারফ্রীর সুবিধা আমার মেয়ের জীবনকে এখন অনেক সহজ আর স্বচ্ছন্দ করে তুলেছে ।

আমি এখন সত্যি নিশ্চিন্ত আর সুখী । আমি এতেই খুশি যে, আমার মেয়েকে এমন-কিছু দিতে পেরেছি, যা আমরা নিজেরা ব্যবহার করবার সুযোগ পাইনি—কেয়ারফ্রীর সুবিধা, কেয়ারফ্রীর স্বাচ্ছন্দ্য । আসলে, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাই তো প্রগতি, তাই না ?

১০টির প্যাকে ও সাশ্রয়কারী ২০টির এবং ৩০টির প্যাকে পাওয়া যায়

এছাড়াও পাবেন, কেয়ারফ্রী এক্সট্রা লার্জ-এর ১০টির প্যাক

কেয়ারফ্রী স্যানিটারি ন্যাপকিন—
পরিবর্তনশীল যুগের উপযুক্ত সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ও সুরক্ষা

Johnson & Johnson

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

এবার রেড্ডি রাজবাড়িতে

মীরা বালসুব্রমনিয়ন

রোববারের সকাল। মেজকার ওখানে গিয়ে দেখি মেজকা খুব মন দিয়ে একখানা বই পড়ছেন। জিজ্ঞেস করলাম, "কী বই পড়ছ মেজকা ? নতুন কোনও থ্রিলার বুঝি ?"

"আরে না, না। এটা ডঃ সলিম আলির 'ইণ্ডিয়ান বার্ডস'।"

"হঠাৎ পাখিদের নিয়ে পড়লে যে ?"

মেজকা বইখানা বন্ধ করে বললেন, "ব্যাপার কী রন্টু, এসেই যে অমন জেরা শুরু করেছিস ?"

"জেরা করলাম কোথায়, জানতে চেয়েছি। মানে, বইটই তো তোমাকে অত পড়তে দেখি না—তাও পাখিদের ওপর লেখা বই। না বলতে চাও, বোলো না।" একটু রেগেই জবাব দিলাম।

মেজকা আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, "আরে, রাগ করছিস কেন ? এমনি বলেছিলাম আর কি। জেরা করা তো ভালই। পুল্লা রেড্ডির টিমে আছিস, জেরা করবি না ? হ্যাঁ, সলিম আলির বই পড়ছি, কারণ, সামনের সপ্তাহে নল-সরোবরে যাচ্ছি আমরা। মাইগ্রেটরি বার্ডস দেখতে। তাই একটু অল্পবিস্তর জেনে রাখা আর কী।"

"নল-সরোবর ? সেটা আবার কোথায় ?"

"গুজরাতে। আমেদাবাদের কাছাকাছি।"

আমি বললাম, "আচ্ছা, মেজকা, ব্যাপার কী বলো তো ? এই তো গত মাসেই আমেদাবাদ গেলাম। আবার ওদিকে

কেন ?"

মেজকা একটু ব্যাজার মুখে বললেন, "আমি তো সেই কথাই বলছিলাম রেড্ডিকে। কিন্তু ও যখন একবার কাজের গন্ধ পেয়েছে···"

"কাজ ? এর মধ্যে রেড্ডিকাকুর কোনও কাজ আছে নাকি ?"

"আমার তো মনে হয় আছে। রোহিতভাইয়ের মারফতই নেমন্তন্নটা এল কি না।"

"কিসের নেমন্তন্ন ?"

"দেখছি গোড়ার কথা তোকে বলাই হয়নি। শোন্, আমেদাবাদ আর রাজকোটের মাঝামাঝি নিমপুর বলে একটা জায়গা আছে। ছোট শহর, এককালে দেশীয় রাজ্য ছিল। নিমপুরের রাজকুমার দিগ্বিজয় সিং আমাদের নেমন্তন্ন করেছেন ওঁদের বাড়ি গিয়ে ক'দিন থাকতে এবং নল-সরোবরে যেতে। শুনলাম মাইগ্রেটরি বার্ডস দেখতে হলে ভরতপুরের পরেই এই নল-সরোবর।"

"এর মধ্যে কাজ এল কোথা থেকে ?"

মেজকা বললেন, "সেটা রেড্ডি এলেই স্পষ্ট হবে। আসবে ও একটু পরেই।"

আমি অগত্যা মেজকার ক্যারমবোর্ডটা নামিয়ে স্ট্রাইক প্র্যাকটিস করতে লাগলাম। এ-সপ্তাহে পাড়ায় একটা ক্যারম কম্পিটিশন আছে। মেজকা বইয়ে মন দিলেন।

রেড্ডি এলেন একটু পরেই। ও হরি, ওঁর হাতেও দেখি আরেকখানা বই, 'বার্ডস অব গুজরাত'। সবাই পক্ষী-বিশারদ হয়ে উঠছি নাকি ? জিজ্ঞেস করলাম, "রেড্ডিকাকু, আমরা নাকি ফের গুজরাত যাচ্ছি ? নল-সরোবরে পাখি দেখতে ?"

"হ্যাঁ, টিকিটের বন্দোবস্ত করে এলাম। তবে এবার ট্রেনে যাচ্ছি। পার্টির পকেটে এবার রেস্ত কম কিনা।"

মেজকা বললেন, "কিন্তু কাজটা কী, সেটাই তো বুঝলাম না।"

"কাজটা সঠিক কী, সেটা আমিও জানি না," জবাব দিলেন পুল্লা রেড্ডি। "অর্থাৎ রোহিতভাই বলতে পারেননি। অকুস্থলে গেলেই নাকি জানতে পারব। এটুকুই শুধু জানি যে, নিমপুরের রাজকুমার দিগ্বিজয় সিং আমাদের একটা কাজ দেবেন, সেটা গোপনীয়, এবং আমরা যে কোনও কাজে ওখানে যাচ্ছি সেটা জানাজানি হলে মুশকিল হবে। তাই এই পাখি দেখবার নেমন্তন্ন। আর পাখি দেখতে দেশের পুব দিক থেকে সোজা পশ্চিমে যাচ্ছি, তাই পাখির বিষয়ে এক-আধটু না জানলে চলবে কেন ?"

যাবার দিনে দেখি পুল্লা রেড্ডি ওঁর সুটকেসে একখানা বড় বাইনোকুলার নিয়েছেন, আর একখানা নোটবুক। নতুন ধরনের কোনও পাখি দেখলেই ডিটেলস নোট করবেন। মেজকা অবশ্য ক'দিন আগে থেকেই সকাল-সন্ধে ওঁর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে পাখি দেখে যাচ্ছেন। ওঁর শুধু আফসোস এই যে, ওঁর ব্যালকনিতে শুধু চড়ুই আর শালিক ছাড়া অন্য পাখির আনাগোনা নেই। তবে নল-সরোবরে গিয়ে যে সাইবেরিয়ান হাঁস আর বক, পেলিক্যান ইত্যাদি দেখা যাবে সে-কথাও জানিয়েছেন আমাকে। সলিম আলির বইখানা আমিও উল্টেপাল্টে দেখেছি বার-কয়েক। অর্থাৎ পাখির বিষয়ে কোনও কথা উঠলে আমাদের কারুরই আর চুপ করে যাওয়ার দরকার নেই।

কলকাতা থেকে আমেদাবাদ সরাসরি যাওয়ার একটা ট্রেন অবশ্য আছে, কিন্তু সেটা বড্ড গড়িয়ে চলে। আমরা তাই গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে চড়ে বম্বে হয়ে যাওয়াই ঠিক করলাম। ভাগ্যক্রমে যেদিন বম্বে পৌঁছলাম আমরা, সেদিন ওখানে পুল্লা রেড্ডির এক খুড়তুতো ভাইয়ের বিয়ে ছিল। তাই বিয়ের ভোজও খাওয়া হয়ে গেল। খাওয়ার শেষে মেজকা একটা বড় ঢেকুর তুলে বললেন, "ফাইন, এক ঢিলে দু' পাখি মারা হয়ে গেল।"

রেড্ডি বললেন, "পাখি দেখতে গিয়ে পাখি মারার কথা তুলো না বোস।"

বম্বে থেকে গুজরাত মেল ছাড়ে রাত সাড়ে ন'টায়। ট্রেনে এসে বিছানা করতে করতে মেজকা বললেন, "রেড্ডি, আমাদের নিতে কেউ আসবে তো ?"

"হ্যাঁ, দিগ্বিজয় সিং গাড়ি আর লোক পাঠাবেন, কথা আছে।"

পরদিন ট্রেন যখন আমেদাবাদ পৌঁছল তখনও আকাশ ভাল করে পরিষ্কার হয়নি, যদিও ঘড়িতে প্রায় সাতটা। অসম্ভব কনকনে শীত। প্লাটফর্মে নেমে দেখি, ঢোলা পাজামা, গরম কোট ও মাংকি ক্যাপ পরে দাঁড়িয়ে আছেন এক ভদ্রলোক। আমাদের দেখে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন, "কিছু মনে করবেন না, আপনারা কি কলকাতা থেকে আসছেন ? মিঃ রেড্ডি অ্যাণ্ড পার্টি ?"

"হ্যাঁ।"

"আমার নাম ঈশ্বরভাই প্যাটেল। সবাই ঈশ্বরভাই বলেই ডাকেন। দিগ্বিজয় সিং আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাদের নিয়ে যেতে। গাড়ি সঙ্গে এনেছি। চলুন।"

মেজকা বললেন, "একটু চা কফি খেয়ে গেলে হত না ?"

ভেবেছিলাম পুল্লা রেড্ডি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন। বলবেন, 'পথে খেয়ে নিলেই চলবে !' কিন্তু উনি তা না করে বললেন, "ঠিক বলেছ বোস। এ ছাড়া আমার দু' একজনের সঙ্গে দেখা করার কথাও আছে। ঈশ্বরভাই, আমি বলি কি, এ-বেলাটা এখানে কাটিয়ে বিকেলে নিমপুরে রওনা হব। কেমন ?"

"আপনাদের যেমন ইচ্ছা। আপনাদের জন্য কোনও হোটেলে বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি তা হলে।"

"কোনও দরকার নেই। কয়েক ঘণ্টা স্টেশনের রিটায়ারিং রুমেই কাটিয়ে দিতে পারব। কী বলো, বোস ? আর আপনাকেও আটকাব না। বরঞ্চ বিকেল চারটে নাগাদ এসে আমাদের নিয়ে যাবেন।"

"ঠিক আছে," বলে ঈশ্বরভাই চলে গেলেন।

উনি চলে গেলে পর মেজকা বললেন, "আরে, রেড্ডি, তোমার যে আবার এই আমেদাবাদেও বন্ধু আছে তা তো বলোনি ?"

"বন্ধুটন্ধু নয়। একটা পরিচয়পত্র নিয়ে এসেছি মাত্র। নিমপুরের রাজার ফ্যামিলির বিষয়ে কিছু জানার জন্য।"

"ঈশ্বরভাইয়ের গাড়িটা রেখে দিলে সুবিধা হত না ?"

"তা হয়তো হত। কিন্তু ইচ্ছে করেই রাখিনি।"

আমি বললাম, "রেড্ডিকাকু বোধহয় চান না যে, ঈশ্বরভাই

জানতে পারেন আমরা কোথায় গিয়েছি। তাই না ?"

পুল্লা রেড্ডি হেসে বললেন, "ঠিক ধরেছ রণ্টু।"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি আর মেজকা পুল্লা রেড্ডির সঙ্গ নিলাম না। আমরা স্নান করে তৈরি হতে হতে এক ফাঁকে গিয়ে রেড্ডি ওঁর দেখা-সাক্ষাৎ সেরে এলেন।

বিকেলে ঈশ্বরভাই এলেন পাঁচটায়। আমরা তৈরিই ছিলাম। রওনা হয়ে গেলাম প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই।

আমেদাবাদ থেকে নিমপুর প্রায় একশো কিলোমিটার হবে। ড্রাইভারটি বেশ পাকা বলে মনে হল। গাড়ি হুহু করে এগিয়ে চলল।

ঈশ্বরভাই ড্রাইভারের সঙ্গে সামনের সিটে বসে ছিলেন, আমরা তিনজন পেছনে। পুল্লা রেড্ডি একটু সামনে ঝুঁকে বললেন, "ঈশ্বরভাই, নিমপুরের রাজ-ফ্যামিলি সম্বন্ধে যদি কিছু একটু বলেন তো ভাল হয়। মানে কারা কারা থাকেন ওখানে···"

ঈশ্বরভাই পালটা প্রশ্ন করে বললেন, "আপনি না দিগ্বিজয় সিংয়ের বন্ধু ?" অর্থাৎ বন্ধু হয়ে বন্ধুর ফ্যামিলি সম্বন্ধে কিছু জানবেন না এটা কেমন কথা ?

রেড্ডি একটু অপ্রস্তুত ভাব দেখিয়ে বললেন, "না, হ্যাঁ, মানে ঠিক পরিচয় নেই ওঁর সঙ্গে। তবে আমাদের এক বন্ধুর বিশেষ বন্ধু উনি। সেই সূত্রেই নেমন্তন্নটা বাগিয়েছি আর কি।"

ঈশ্বরভাই বিরস মুখে বললেন, "সেটা নতুন কিছু নয়। দিগ্বিজয় সিংয়ের অতিথি সারা বছরই লেগে থাকে। তার মধ্যে অর্ধেক লোককেই উনি জীবনে দেখেননি।"

আমি আর মেজকা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। মনে হচ্ছে দিগ্বিজয় সিংয়ের অতিথি হিসেবে আমাদের খুব একটা ভাল অভ্যর্থনা জুটবে না। কী আর করা।

আমরা দিগ্বিজয় সিংয়ের বন্ধুর বন্ধু শোনার পর ঈশ্বরভাই আর কিছু বলার প্রয়োজন মনে করেননি। পুল্লা রেড্ডি অবশ্য ছাড়ার পাত্র নন। আবার প্রশ্ন করলেন, "নিমপুরের রাজবাড়িতে কে কে থাকেন ?"

অনিচ্ছা সহকারে জবাব দিলেন ঈশ্বরভাই, "থাকেন বড়কুমার দিগ্বিজয় সিং ও তাঁর স্ত্রী, ছোটকুমার রণবিজয় সিং (উনি আজও অবিবাহিত), রাজমাতা পুষ্পবতী দেবী। এ ছাড়া আরও কয়েকজন আত্মীয়, আশ্রিত ইত্যাদি। রাজা জগৎনারায়ণ মারা গেছেন প্রায় ছ' মাস হল।"

পুল্লা রেড্ডি প্রশ্ন করলেন, "জগৎনারায়ণ সিংয়ের মৃত্যুর পর তো তাঁর বড়ছেলে দিগ্বিজয়কেই রাজা বলার কথা। তবে তাঁকে এখনও বড়কুমার বলছেন যে ?"

মেজকা মাঝখান থেকে টিপ্পনী কাটলেন, "রাজা হওয়ার মতো রাজত্ব এখনও আছে ?"

ঈশ্বরভাই কঠিন স্বরে বললেন, "এস্টেট ছাড়াও রাজা জগৎনারায়ণের ব্যক্তিগত সম্পত্তি অনেক ছিল। তবে এ-সব খবর পাখি দেখতে লাগবে নাকি ?"

"আরে না, না,···" পুল্লা রেড্ডি এমন ভাব দেখালেন যেন ভীষণ অপ্রস্তুত হয়েছেন। "তবে কী জানেন, রাজারাজড়ার অতিথি হওয়া তো সচরাচর ঘটে না, তাই একটু কৌতূহল হচ্ছে আর কি।"

ঈশ্বরভাই এর পর আর মুখ খুললেন না। আমরাও চুপচাপ রইলাম।

গাড়ি যখন নিমপুরে পৌঁছল, তখন সাতটা বেজে গেছে। রাজবাড়ি শহরের একধারে। বাস-স্টেশন, সরকারি অতিথিশালা, বাজার, এ-সবের ভিড় পার করে অ্যাম্বাস্যাডারখানা এক বিশাল গেটের মধ্যে যখন ঢুকল, তখন গাছপালা আর অন্ধকার ছাড়া কিছু নজরে পড়ল না। আমি মেজকাকে কানে কানে বললাম, "মেজকা, রাজারা অন্ধকারে থাকতে ভালবাসেন কেন, বলো তো ?"

মেজকা বললেন, "অন্ধকার কোথায় ? ওই তো আলো দেখা যাচ্ছে।"

গাড়িটা বাঁক নিতে এবার আমিও দেখতে পেলাম। রাজবাড়িতে বিজলি-আলো জ্বলছে ঠিকই, তবে খুব কম পাওয়ারের। আমাদের গাড়িখানা কিন্তু সামনের গাড়িবারান্দায় না-থেমে পাশ দিয়ে ঘুরে চলে এল এবং তারপর পেছন দিকে যে-জায়গায় এসে থামল, সেটাও আরেকটা গাড়িবারান্দা। এই গাড়িবারান্দার ছাত দিয়েই সামনের ও পেছনের দুটো মহলের যোগাযোগ।

গাড়িটা থামতেই একজন উর্দিপরা আর্দালি এসে দরজা খুলে ধরল। আমরা নামলাম। ডান দিকের মহলের বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ উঠেই যাঁকে দেখা গেল, উনি যে রাজকুমারদের মধ্যে একজন হবেন, তা নিশ্চিত। লম্বা-চওড়া দশাসই ভদ্রলোক, মোটা গোঁফ, তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি, পরনে টাই-সমেত হালফ্যাশানের সুট।

মেজকা প্রথমে ছিলেন। রাজকুমার ওঁর দিকে হ্যাণ্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে বললেন, "গুড ইভনিং।"

"গুড ইভনিং মিঃ দিগ্বিজয় সিং। প্লিজড টু মিট ইউ। আই

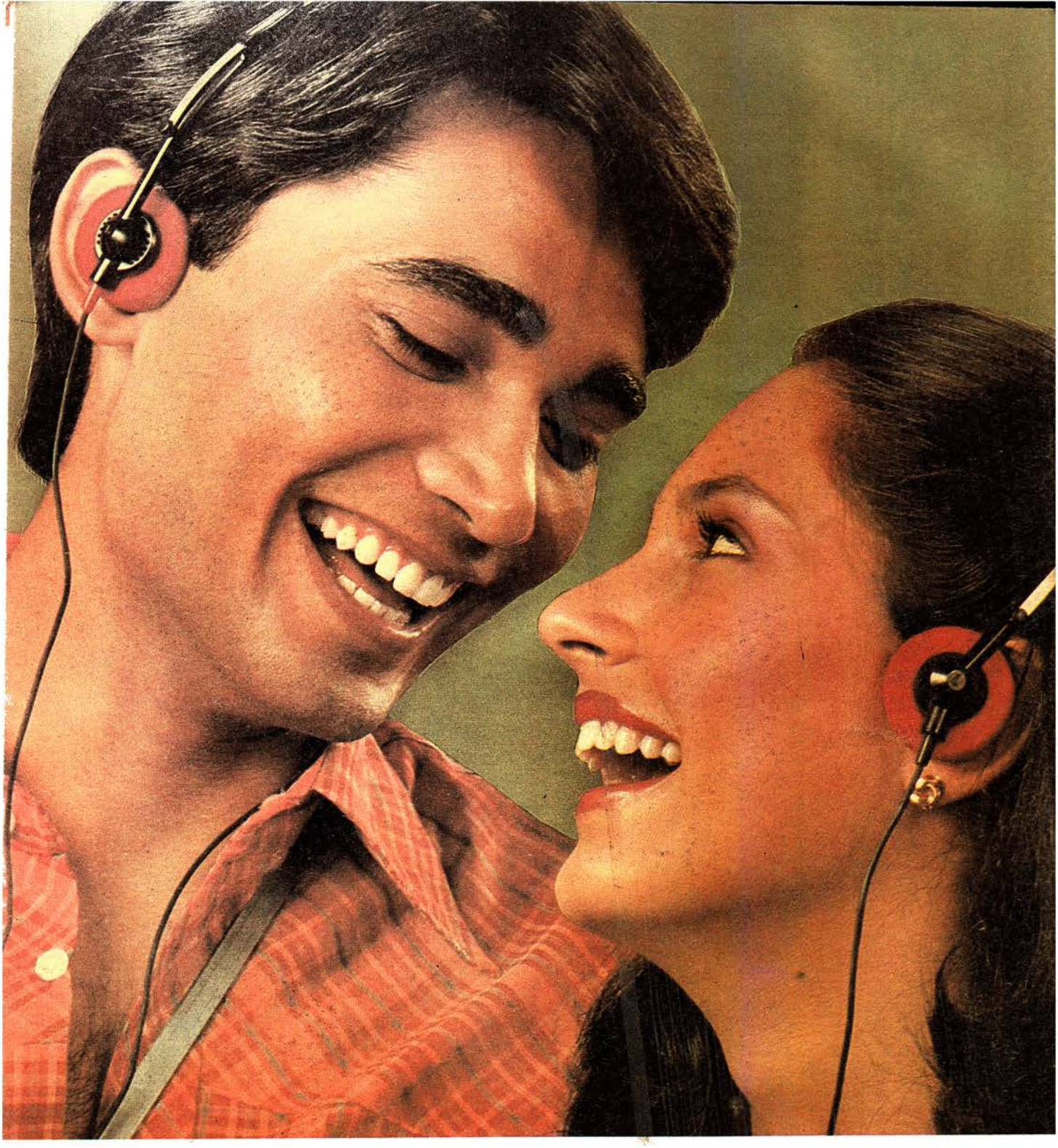

কাছে, আরো কাছে পেতে–ক্লোজ-আপ

এই অলস, কুয়াশাঘেরা, পাগল করা গ্রীষ্মের সন্ধ্যাবেলা...হাসিখেলা ভাগ ক'রে নিয়ে, মুখর, গুঞ্জনে ভরা বেলা—আর এই মিলন-খেলায় মেতে উঠতে আপনার মধ্যে আছে ভরপুর আত্মবিশ্বাস—ক্লোজ-আপের আত্মবিশ্বাস!

স্বচ্ছ লাল ক্লোজ-আপের অতি সাদা করার দুটি বিশেষ উপাদান দিয়ে আপনার দাঁত হয় সবচেয়ে সাদা আর এর বিশেষ মাউথওয়াশ দিয়ে আপনার নিঃশ্বাস হয় সবচেয়ে তাজা!

তাই ক্লোজ-আপের হাসি হাসুন আর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাছে, আরো কাছে আসুন—কারণ, ক্লোজ-আপ যে শুধু কাছে, আরো কাছে পাওয়ার জন্যেই!

হিন্দুস্থান লিভারের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

একাধারে টুথপেস্ট আর মাউথওয়াশ

LINTAS CX592619 BG

অ্যাম বোস, ইনি পুল্লা রেড্ডি, আর এ আমার ভাইপো রন্টু।"

মেজকার কথার স্রোতকে থামিয়ে দিয়ে রাজকুমার বললেন, "আমি দিগ্বিজয় নই, রণবিজয়। দিগ্বিজয় বাইরে গেছে একটা কাজে। ফিরতে রাত হবে। আপনারা ওপরে যান।"

বারান্দার পরেই একটা বড় হল-ঘর। তাতে নানান ধরনের স্ট্যাচু, পেন্টিং এসব সাজানো। সেই হল-ঘর থেকেই কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে নিচু গলায় মেজকা বললেন, "কী কেলেংকারি বল তো দেখি, রণবিজয়কে দিগ্বিজয় ভাবলাম।"

রেড্ডি বললেন, "তাতে কী হয়েছে। তুমি তো আর দেখোনি কাউকেই। ওঁরই উচিত ছিল নিজের পরিচয় দেওয়া।"

রণবিজয় আমাদের সঙ্গে ওপরে আসেননি। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমরা এলাম আরেকটা হল-ঘরে। এ-ঘরে ছিল কারুকার্য করা সোফা চেয়ার টেবিল। মেজেতে পুরু কার্পেট, যদিও জায়গায় জায়গায় ছিন্নাবস্থা। ঘরের কোণে চাইনিজ ভাস, দেয়াল-আলমারিতে নানা ধরনের পোর্সিলেনের স্ট্যাচু, দেয়ালে পূর্বপুরুষদের অয়েল পেন্টিং, মাথার ওপরে বিরাট কাঁচের ঝাড়লণ্ঠন, যদিও মোমবাতির বদলে তাতে ইলেকট্রিক বাল্‌ব্ লাগানো।

আমি বললাম, "মেজকা একেবারে যে গল্পে পড়া রাজপুরীর মতো মনে হচ্ছে!..."

আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্য ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন ঈশ্বরভাই। উনি আমাদের বসতে বললেন, ওঁর সামান্য ইশারাতেই একজন বেয়ারা স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ গ্লাসে অরেঞ্জ স্কোয়াশ নিয়ে এল। ঈশ্বরভাই জিজ্ঞেস করলেন চা কফি কিছু লাগবে কি না।

পুল্লা রেড্ডি বললেন, "কফি হলে তো ভালই হয়।"

কফির অর্ডার দিলেন ঈশ্বরভাই। তারপর বললেন, "বড়কুমার হঠাৎ একটা কাজে রাজকোট গেছেন। ফিরতে বেশি রাত হবে। আজ আর আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। বড়কুমারের স্ত্রী অবশ্য আসছেন একটু পরেই। তবে বড়কুমার বলে গেছেন যে, কাল ভোরেই আপনাদের নল-সরোবরে নিয়ে যাবেন। ভোর ছ'টায় রওনা হবেন। কাজেই আপনারা তৈরি থাকবেন সেই অনুযায়ী।"

"ভোর ছ'টায়?" মেজকার প্রশ্ন। "তখন যে বড্ড শীত হবে।"

"তা তো হবেই," জবাব দিলেন পুল্লা রেড্ডি। "তবে পাখি দেখার জন্য ওই সময়টাই প্রশস্ত।"

এমন সময় পর্দা সরিয়ে যিনি ঘরে ঢুকলেন, ঈশ্বরভাইয়ের তড়াক করে লাফিয়ে ওঠা দেখে বুঝলাম, তিনিই দিগ্বিজয় সিংয়ের স্ত্রী হবেন। কিন্তু ওঁর বেশভূষা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। রাজকুমারের স্ত্রী, কোথায় জমকালো শাড়ি-গয়নায় মুড়ে থাকবেন, তা নয়, ওঁর পরনে আধুনিকতম ফেডেড জিনস, গায়ে ক্রিম রঙের গরম কাপড়ের শার্ট, পায়ে পুঁতির কারুকার্য করা সাদা চামড়ার পাম্পশু। চুল বয়-কাট করে ছাঁটা। বগলে একটা ধপধপে সাদা পমেরানিয়ান কুকুর।

এসেই উনি সবার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে বললেন, "হাউ ডু ইউ ডু! আই অ্যাম স্নেহলতা..."

কিন্তু সাজপোশাকে যাই হোন, স্নেহলতা দেখলাম কথাবার্তায় চমৎকার ও মিশুকে। চট করে সবাইকে আপন করে নিতে জানেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেশ মন খুলে গল্প শুরু করে দিলাম আমরা। উনি যে একজন ভাবী রাজার স্ত্রী, সে-কথা মনেই রইল না আমাদের।

কিছুক্ষণ পর খাওয়ার ডাক এল।

স্নেহলতা বললেন, "আপনাদের জিনিসপত্র গেস্টরুমে রাখা হয়েছে। হাতমুখ ধুয়ে আসুন আপনারা। আমরা আবার একটু তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া খেয়ে নিই।"

রেড্ডি বললেন, "বড়কুমার?"

"উনি রাজকোর্ট থেকেই ডিনার সেরে ফিরবেন।"

বেয়ারা আমাদের গেস্টরুমে নিয়ে এল। ঘর দেখে তো আমরা ট্যারা! বিরাট ঘরের তিনকোণে তিনটে বিরাট মেহগিনি কাঠের পালঙ্ক, নরম গদিতে টান-টান করে বিছানা পাতা। সাদা বিলিতি নেটের মশারি। একটা বড় র‍্যাকে আমাদের সুটকেসগুলো রাখা। টেবিলের ওপর ফ্লাস্কে রাখা ঠাণ্ডা জল, কাঁচের গ্লাস আর একটা অ্যালার্ম-ক্লক। মেজকা সপ্রশংস স্বরে বললেন, "সত্যি, রাজরাজড়ার ব্যাপারই আলাদা।"

রেড্ডি বললেন, "বোস্, কিউরিওগুলো দেখেছ? মনে হচ্ছে এঁরা কিউরিওর পেছনে প্রচুর খরচা করেছেন।"

কথাটা সত্যি। এ-ঘরটাও নানা মূর্তি, ছবি, এসব দিয়ে সাজানো। তবে এ-ঘরের মূর্তিগুলো প্রায় সবই পেতল বা ব্রোঞ্জের। পুল্লা রেড্ডি দেখে বললেন, "বেশির ভাগই সাউথ ইণ্ডিয়ার। কিছু নেপালেরও রয়েছে অবশ্য।"

মেজকা বলেন, "স্ট্যাচু দেখার পরে খেতে চলো। শুনলে না, ওঁরা তাড়াতাড়ি খান?"

খাবার টেবিলে এসে দেখলাম, স্নেহলতা তো আছেনই,

আছেন রণবিজয়ও। শুনলাম রাজমাতা নিজের মহলেই খাওয়া-দাওয়া করেন।

রণবিজয় বেশ গম্ভীর। দু'একটা মামুলি কথাবার্তা বললেন মাত্র। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, স্নেহলতাকেও বেশ গম্ভীর মনে হল। রণবিজয়ের ভয়েই কি না কে জানে। পুল্লা রেড্ডি স্নেহলতার পাশে বসে ছিলেন। ওঁর সঙ্গে নল-সরোবরের পাখি নিয়ে দু'চার কথা মাত্র বললেন স্নেহলতা।

খাওয়ার শেষে চলে আসব, এমন সময় স্নেহলতা বললেন, "আপনারা ভোরে সময় মতো তৈরি থাকবেন কিন্তু। সাড়ে-পাঁচটায় বেড-টি।"

আমাদের ঘরে এসে যে যার বিছানায় ঢুকে পড়লাম। মেজকা বললেন, "আর সব তো ভালই মনে হচ্ছে, কিন্তু আসল কাজ কী সেটাই তো জানা হল না এখনও।"

পুল্লা রেড্ডি বললেন, "হবে, হবে। ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? আর দায়টা তো যে কাজ দেবে তার, তোমার-আমার নয়। এবার ঘুমিয়ে পড়া যাক্। আবার ভোরে উঠতে হবে—" বলে পাশ ফিরে শুলেন উনি।

মেজকার খাটের দিকে চেয়ে দেখি ওঁরও নাক ডাকতে শুরু করে দিয়েছে।

॥ ২ ॥

শোবার আগে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলেন পুল্লা রেড্ডি। পাঁচটায় অ্যালার্ম বাজলে উঠে দেখি পুল্লা রেড্ডি উঠে পড়েছেন আগেই। মেজকা অবশ্য তখনও ঘুমে। আমাদের হাতমুখ ধোওয়া হলে ওঁকে ডেকে তুললাম।

ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে পাঁচটায় ঘরের দরজায় টকটক শব্দ হল। দরজা খুলে দেখি, চা নিয়ে এসেছে বেয়ারা।

মিনিট পনেরো পরে ফের বেয়ারার আর্বিভাব। পেয়ালা নিতে এসেছে। জানাল, বড়কুমার তৈরি হচ্ছেন।

রেড্ডি বললেন, "বলো, আমরাও তৈরি আছি।"

ছ'টা বাজার মিনিট পাঁচেক আগে আবার দরজায় টকটক শব্দ। আন্দাজ করলাম, বড় রাজকুমার হবেন। কিন্তু দরজা খুলে চমকে গেলাম। ইনিই কি দিগ্বিজয় সিং ? রণবিজয়ের বড় ভাই দিগ্বিজয়। তিনিও ছোট ভাইয়ের মতোই লম্বাচওড়া হবেন ভেবেছিলাম। কিন্তু যিনি এলেন, তিনি বেঁটেখাটো, গোলগাল, হাসি-হাসি মুখ, ঝোলা ট্রাউজারের ওপরে একটা গরম ওভারকোট চাপানো, ভেতর থেকে সাফারি স্যুটের টপ্‌টা দেখা যাচ্ছে।

"গুডমর্নিং, গুডমর্নিং, ওয়েল কাম টু নিমপুর···" বলে হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন উনি। ওঁর পেছনেই দাঁড়িয়ে স্নেহলতা। অতএব সন্দেহ রইল না যে, এই বেঁটে গোলগাল মানুষটিই দিগ্বিজয় সিং। অবশ্য একটু পরেই স্নেহলতা পরিচয়পর্ব সারা করলেন।

পুল্লা রেড্ডি স্নেহলতাকে জিজ্ঞেস করলেন "আপনি যাচ্ছেন না ?"

দিগ্বিজয় বললেন, "না, উনি যাচ্ছেন না। কিন্তু ওঁর উপস্থিতি টের পাওয়া যাবে এইটায়।" বলে পাশে রাখা একখানা বেতের ঝুড়ির দিকে আঙুল দেখালেন। বুঝলাম ওতে আমাদের ব্রেকফাস্টের জিনিস রাখা আছে।

আমরা রওনা হলাম একটা জিপে। জিপের পেছনে একটা ট্রেলার লাগানো, তাতে চড়ানো আছে একখানা ফাইবার গ্লাসের নৌকো।

পুল্লা রেড্ডির সপ্রশংস দৃষ্টি অনুসরণ করে দিগ্বিজয় বললেন, "নৌকোটা চমৎকার, স্পেশ্যাল অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়েছি।"

জিপের চালকের আসনে বসলেন দিগ্বিজয় স্বয়ং। দু'জন সহকারী নৌকো বাইবার দাঁড়, ব্রেকফাস্টের ঝুড়ি, ফ্লাস্ক্ এসব নিয়ে নৌকোতে উঠে বসল।

জিপ ছাড়ল। হাইওয়ে ছেড়ে একটা সরু রাস্তা দিয়ে চলল। দিগ্বিজয়ের গাড়ি চালানোর হাত দেখলাম বেশ পাকা। বললেন, "সাধারণত ট্যুরিস্টেরা নল-সরোবরের যে দিকটায় যায়, আমরা যাচ্ছি ঠিক তার উল্টো দিকে। চায়ের দোকান-টোকান পাবেন না সত্যি, তবে পাখি পাবেন অনেক বেশি।"

রেড্ডি বললেন, "মিঃ সিং, আমাদের কী কাজের জন্য এনেছেন সেটাই জানতে পারলাম না।"

"হবে, হবে। ব্যস্ত হবেন না। সকালটা এনজয় করুন না কেন। ঠাণ্ডাটা কী চমৎকার বলুন তো !"

আমি আর মেজকা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। ঠাণ্ডাটা আমাদের মতে চমৎকার নয়, হাড়কাঁপানো।

প্রায় দশ কিলোমিটার যাওয়ার পরে গাড়ি থামালেন দিগ্বিজয়। বললেন, "ব্রেকফাস্টটা খেয়ে নেওয়া যাক্।"

ওঁর সহকারী এসে একটা গাছের তলায় শতরঞ্চি বিছিয়ে দিল। খাবারের ঝুড়ি খুলে দেখা গেল, ওতে আছে দু'তিন রকমের স্যাণ্ডউইচ, ডিমসেদ্ধ, কলা, আপেল আর চাটনি ও আলু-পরোটা। খাবারের বহর দেখে মেজকার মুখখানা হাসিতে ভরে গেল। বললেন, "মিসেস সিংয়ের দূরদৃষ্টি আছে।"

খেতে খেতে দিগ্বিজয় নিচু গলায় বলতে শুরু করলেন, "আপনারা বোধহয় শুনেছেন যে, মাস ছয়েক আগে আমার বাবা জগৎনারায়ণ মারা গেছেন ?"

"হ্যাঁ, শুনলাম ঈশ্বরভাইয়ের কাছে।"

"এও শুনেছেন বোধহয় যে, ওঁর উইল নিয়ে একটা মামলা চলছে আমার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ?"

"না, সেটা শুনিনি।" জবাব দিলেন পুল্লা রেড্ডি।

"ব্যাপার এই যে, আমাদের এস্টেটখানা ছোট হলেও বাবার নিজস্ব অনেক সম্পত্তি আছে। জমিজমা, বাজার, কোম্পানির শেয়ার, এইসব। বাবার মৃত্যুর পর আমার ছোট ভাই একখানা উইল বার করেন, সেটা বাবা বছর দুয়েক আগে করেছিলেন। তাতে সমস্ত সম্পত্তি রণবিজয়কে দেওয়া হয়েছে। আমি পুরোপুরি বঞ্চিত।

"বাবা যে এইরকম একটা উইল করেছিলেন, সেটা অবশ্য আমার জানা ছিল। তার কারণও আমি জানতাম। বাবা স্নেহলতার চালচলন একদম পছন্দ করতে পারেননি। স্নেহলতার সঙ্গে-সঙ্গে আমাকেও তাই বঞ্চিত করেছিলেন।"

"স্নেহলতা কি কোনও রাজবংশের মেয়ে নন ?"

"না, না, সে সব কিছু নয়। স্নেহলতার জন্ম বিশিষ্ট রাজবংশে। কিন্তু ও মানুষ হয়েছে লণ্ডনে। অতএব বুঝতেই পারেন যে, আমাদের পুরনো প্রথার চালচলনে ও একেবারেই অভ্যস্ত নয়। ওর মতে রাজারাজড়ার যুগ শেষ হয়েছে।

সাধারণ মানুষ হিসেবেই ও বাঁচতে চায়। ইনফ্যাক্ট, আমিও তাই চাই। কিন্তু স্নেহলতা আচারে ব্যবহারে যত আধুনিকই হোক না কেন, মনটা ওর ভাল। ক্রমশ বাবা বুঝতে পেরেছিলেন সেটা, আরও বুঝতে পারলেন যখন অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়লেন। আমি বা রণবিজয় যখন আমেদাবাদ থেকে ডাক্তার নার্স আনিয়েই কর্তব্য পালন করেছি, স্নেহলতা তখন রাতের পর রাত জেগে বাবার সেবা করেছে হাসিমুখে। অতএব বাবা ওঁর আগের উইল বদলাবেন এমন আশা করাটা আমার পক্ষে খুব অন্যায় হয়নি বোধহয়। তবে বাবার কাছে উইলের কথা সরাসরি তুলতে সংকোচ হত। স্নেহলতারও আপত্তি ছিল এ-বিষয়ে।

"কিন্তু বাবা উইল বদলাতে চাইলেও তা করতে পারছিলেন না। বাদ সাধছিলেন রাজমাতা, রণবিজয়ের মা ও আমার সৎ-মা। শেষের দিকে রণবিজয় ও রাজমাতা প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই বাবাকে চোখে-চোখে রাখতেন। কখনও স্নেহলতার সঙ্গে একা থাকতে দিতেন না। কারণ, নতুন উইল না করতে পারলে আগের উইলই বহাল থাকবে এবং রণবিজয়ই সব সম্পত্তি পাবে। আমরা বুঝতে পারছিলাম কী হতে যাচ্ছে, কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারিনি।

"কিন্তু যখন প্রায় শেষ সময় হয়ে এসেছে তখন বাবা আমাকে ডেকে নিয়ে খালি দুটো কথা বলেছিলেন, 'নতুন উইল···এ ঘরে।' আর কিছু বলার সুযোগ পাননি, ঘরে রণবিজয়কে দেখে চুপ করে গিয়েছিলেন। এর কয়েক মিনিট পরেই সব শেষ হয়ে যায়।

"মিঃ রেড্ডি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বাবা অত পাহারা সত্ত্বেও নতুন উইল করে গিয়েছিলেন, যদিও তা আমাদের উকিলকে দিয়ে যেতে পারেননি। তাই রণবিজয় যখন বাবার পুরনো উইলখানা বার করল, তখন আমি ওখানা জাল বলে মামলা রুজু করেছি, যদিও জানি ওখানা জাল নয়। আমার উদ্দেশ্য কিছু সময় পাওয়া। তা পেলে শেষের উইলখানা খুঁজে বার করব। আর নতুন উইল যে করেছিলেন বাবা, তাঁরও প্রমাণ পেয়েছি দিন দশেক আগে। এই দেখুন···"

পকেট থেকে একখানা এয়ার-লেটার বার করলেন দিগ্বিজয় সিং। দেখলাম ওতে অস্ট্রেলিয়ার স্ট্যাম্প লাগানো।

"চিঠিখানা কে লিখেছেন?" পুল্লা রেড্ডি জিজ্ঞেস করলেন।

"লিখেছেন মিস্ রবার্টস্ নামে একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রমহিলা। বাবার অসুখের সময় নার্স ছিলেন। অস্ট্রেলিয়া চলে গেছেন সম্প্রতি। আমার প্রশ্নের উত্তরে উনি জানিয়েছেন যে, বাবা একদিন একখানা কাগজে ওঁর ও ওঁর সঙ্গের আয়ার সই নিয়েছিলেন, কিন্তু কাগজের লেখা ছিল গুজরাতিতে, তাই উনি তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু জানেন না। আর এও জানেন না যে, বাবা কোথায় কাগজটা রেখেছিলেন। কিন্তু অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, ওই কাগজখানা আর কিছু নয়, বাবার নতুন উইল। আপনি কী বলেন মিঃ রেড্ডি?"

"মনে তো হচ্ছে তাই। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকাটা কী?"

"বলছি। আপনারা যে-ঘরে আছেন, বাবা অসুস্থ অবস্থায় সেই ঘরেই ছিলেন। সে-ঘরেই মারা গেছেন। আমার মনে হয়, উইলখানা সেই ঘরেই লুকোনো আছে, কারণ বাবার পক্ষে উঠে গিয়ে অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না।"

"আপনি সেই ঘরে খোঁজেননি?"

"ওপর-ওপর খুঁজেছি, পাইনি। আসলে ওরকম একটা উইল থাকতে পারে এ-কথার আভাস কাউকেই দিইনি, এক স্নেহলতা ছাড়া। কারণ তা হলে রণবিজয়ও তা খুঁজতে শুরু করবে, এবং হাতে পেলে ওটি নষ্ট করে ফেলবে। আমি চাই, ক'দিন আপনারা এখানে থাকুন এবং ঘরটায় ভাল করে খুঁজুন।"

"ওটা তো আপনাদের গেস্টরুম। ওখানে হয়তো অনেকেই থেকেছে, আপনার বাবা মারা যাওয়ার পর। জিনিসপত্র যেমন ছিল তেমনি আছে?"

দিগ্বিজয় একটু চিন্তা করে বললেন, "হ্যাঁ, মোটামুটি ঠিকই আছে। তবে ওটা আমাদের গেস্টরুম নয়। বাবারই ঘর ছিল ওটা। ইন ফ্যাক্ট, আপনাদের ঠিক এ-সময় আনানোর একটা কারণ হচ্ছে আমাদের অন্য গেস্টরুমগুলোতে অন্য আত্মীয়েরা রয়েছেন, অতএব এই ঘরটায় আপনাদের থাকতে দিলে কেউ

গল্পের পিপাসা মেটানো, জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করা

ননীগোপাল চক্রবর্তী জানেন, ছোট্টরা কী শুনলে খুশি। এও জানেন যে, কীভাবে গল্পের পিপাসা-মিটিয়েও তাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে পূর্ণ করে তোলা যায়। তাই তাঁর চারখানি বই-ই চার রকম স্বাদের। যেমন সদ্য-প্রকাশিত 'ফুড়ুৎ গুড়গুড়ি'। খুব ছোটদের জন্য এ এক দারুণ গল্পের বই। গল্প তো নয়, রূপকথা। রূপকথা, উপকথা, লোকগাথা সমস্ত-কিছু মিশিয়ে আরেকটি গল্পের বই 'চরকাবুড়ী'। 'পীর ফকিরের আস্তানায়' আবার আলাদারকম। এপার বাংলা থেকে ওপার বাংলা পর্যন্ত ছড়ানো পীর ফকিরদের আস্তানার সঙ্গে মিশে-থাকা ইতিহাস ও জনশ্রুতির বিচিত্র বিবরণ এ-বইতে শুনিয়েছেন তিনি। আর,'যাদুঘরে চল যাই'তে কলকাতা যাদুঘরের কোন্ ঘরে কী রয়েছে তারই শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিচয়। প্রত্যেকটি বইতেই প্রচুর অলঙ্করণ।

ননীগোপাল চক্রবর্তীর বই

ফুড়ুৎ গুড়গুড়ি ১০·০০
চরকাবুড়ী ৬·০০
পীর ফকিরের আস্তানায় ৬·০০
যাদুঘরে চল যাই ৬·০০

রবীন্দ্রকন্যা মাধুরীলতার গল্প আর চিঠি

মাধুরীলতা রবীন্দ্রনাথের মেয়ে, এটা একটা পরিচয়। আরেকটি বড়ো পরিচয়, মাধুরীলতা খুব সুন্দরসব গল্প লিখেছেন। 'ওর ক্ষমতা ছিল'—মেয়ের গল্প-লেখা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি সম্পূর্ণ যথার্থ মনে হয় 'মাধুরীলতার গল্প' বইটি পড়লে। কী সুন্দর ভাষা, কী সুন্দর বিষয়। আরেকটি সুন্দর বই 'মাধুরীলতার চিঠি'। মেয়ের লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির এই সংগ্রহে যেন অচেনা এক রবীন্দ্রনাথকে পাই আমরা, যে-রবীন্দ্রনাথ সংসারী, যিনি কন্যার আবদার রাখেন, মেয়েকে উপদেশ দেন বিবাহ-পরবর্তী জীবনের জন্য।
দুটি বই-ই সম্পাদনা করেছেন পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

মাধুরীলতার চিঠি ৭·০০
মাধুরীলতার গল্প ৬·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা—৯

কিছু মনে করতে পারবে না।"

"আমাদের উইল খোঁজাটা সবার অজান্তে হোক, এই তো চান আপনি ?"

"নিশ্চয়ই। সবাই জানে আপনারা পাখি দেখতে এসেছেন।"

রেড্ডি বললেন, "কিন্তু পাখি দেখা তো এক দিনেই শেষ হয়ে যাবে, এরপর আমাদের নিমপুর থেকে যাওয়ার যুক্তি কোথায় ?"

দিগ্বিজয় বললেন, "ছুতো বার করার ভার আপনার ওপর।"

মেজকা বললেন, "কেন, অফিসে এত খাটাখাটুনি করি আমরা, আমাদের একটু বিশ্রামও তো দরকার হতে পারে ?"

দিগ্বিজয় বললেন, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।"

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ফের রওনা দিলাম আমরা। দিগ্বিজয় গাড়ি চালাতে চালাতে শিস্ দিয়ে সুর ভাঁজতে লাগলেন, যেন উইল খোঁজার প্রবলেমটা পুল্লা রেড্ডির কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে হাল্কা হয়ে গেছেন উনি। রেড্ডি চুপ করেই রইলেন ; শুধু ওঁর কপালের ছোট্ট ভাঁজটা দেখে বোঝা গেল যে, উনি গভীরভাবে চিন্তা করছেন কিছু।

নল-সরোবরে পৌঁছলাম আমরা। বিরাট এই সরোবর। যেদিকে চোখ যায়, শুধু জল আর জল। তবে শুনলাম খুবই অগভীর, ৩/৪ ফুটের বেশি জল হবে না কোথাও। জলের ওপর ভাসছে নানা জাতের হাঁস, পাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে হেরন, এগ্রেট ইত্যাদি বকজাতীয় পাখি।

জিপের ট্রেলার থেকে আমাদের নৌকোখানা নামানো হল গ্রামবাসীদের সাহায্যে। দিগ্বিজয় সিংয়ের সহকারীরা জিনিসপত্র নৌকোয় তুলে দিল। গ্রামের দু'জন মাঝি দাঁড় বাইবে ঠিক হল।

মেজকা আগেভাগেই নৌকোয় উঠে পড়লেন। রেড্ডির ঝোলা থেকে ওঁর বাইনোকুলারখানা বার করে নিয়েছিলেন মেজকা। ওটা চোখে লাগিয়েই চিৎকার করে বলে উঠলেন, "দ্যাখ রন্টু, পেলিক্যান···"

রেড্ডি বললেন, "কই, দেখি দেখি···"

আর তখনই কাণ্ডটা হল। নৌকোয় পা রাখতে গিয়ে পা পিছলে গেল রেড্ডির। ধপ করে জলকাদার মধ্যে বসে পড়লেন উনি।

"আহা," দিগ্বিজয় সিং এগিয়ে এলেন "লাগল বুঝি ?"

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন রেড্ডি। বললেন, "লাগাটা তেমন কিছু নয়। কিন্তু ভিজে জামাকাপড়টা বদলাতে পারলে ভাল হত।"

"দ্যাট্স নো প্রবলেম।" বললেন দিগ্বিজয়।

নল-সরোবরের পাড়েই একটা গ্রাম। বাড়ি-ঘরদোর খুব ছিমছাম না হলেও লোকের হাতে পয়সা আছে মনে হল। মেয়েদের পরনে দামি কাপড়ের ঘাগরা, পুরুষদের পরনে টেরিলিনের প্যান্ট, হাতে ট্রানজিস্টার, তাই রেড্ডির জন্য এক সেট শার্ট-প্যান্ট যোগাড় করতে কোনও অসুবিধা হল না দিগ্বিজয়ের। নিজের কাপড় ছেড়ে হালকাভাবে হালফ্যাশনের শার্টপ্যান্ট পরে যখন ফিরে এলেন রেড্ডি, তখন ওঁকে বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছিল।

কিন্তু উনি এসে বললেন, "ইউ আর রাইট মিঃ সিং। তখন মনে হয়েছিল লাগেনি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কোমরটা বেশ কনকন করছে।"

মেজকা উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, "হবেই তো, তা হাড় ক'খানা তো খুব কচি নয় !"

দিগ্বিজয় বললেন, "তা হলে ?"

রেড্ডি অম্লান বদনে বললেন, "তাহলে আর কী। আজ আর পাখি দেখা হবে না বলে মনে হচ্ছে। চলুন ফিরে যাই।"

"ফিরে যাব ?" কী একটা বলতে গিয়েও রেড্ডির দিকে চোখ পড়তে থেমে গেলেন দিগ্বিজয় সিং। আমি তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে চেয়ে দেখি রেড্ডির চোখ দুটো দুষ্টুমির হাসিতে ভরা, দেখে মনেই হল না যে, ওঁর কোমর কনকন করছে।

ওঁরা এগিয়ে গেলে অন্যদের কান বাঁচিয়ে আমি মেজকাকে বললাম, "রেড্ডিকাকুর কিছু হয়নি মনে হচ্ছে। এটা হয়তো নিমপুরে দু'দিন বেশি থাকার ছল।"

"অ্যাঁ ? কিন্তু রণবিজয় চটে যাবেন না তো ?"

ইন ফ্যাক্ট, আমাদের এ ভাবে ফিরতে দেখে রণবিজয় প্রথমটা খুব অবাক হলেও পরে ওঁকে বেশ বিরক্ত দেখাচ্ছিল। বড় ভাইয়ের দিকে ফিরে বললেন, "বন্ধুরা থাকায় তো খুব সুবিধেই হবে তোমার, আড্ডাটা জমবে ভাল।"

দিগ্বিজয় বললেন, "আড্ডা কোথায় ! রেড্ডির কোমর কনকন করছে, ও শুয়ে থাকবে এবাব।"

স্নেহলতা এসে উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, "মিঃ রেড্ডি, ডাক্তার ডাকব ?"

"আরে না, না। ব্যস্ত হবেন না। একটু শুয়ে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।"

আমরা তাড়াতাড়ি নিজেদের ঘরে চলে এলাম। রেড্ডি বিছানায় শুয়ে পড়ে বললেন, "বোস, আমাদের এখন চিন্তা করতে হবে এই ঘরে কোথায় উইলটা থাকতে পারে।"

মেজকা বললেন, "রন্টু, তুই দেয়ালগুলোতে একটু ঠুকে-ঠুকে দ্যাখ্, কোথাও ফাঁপা ইঁট বা অন্য লুকোবার জায়গা রয়েছে কি না।"

রেড্ডি হেসে বললেন, "না, না, সে-সব দরকার নেই। জগৎনারায়ণ ছিলেন অসুস্থ। উনি তো আর উঠে দেওয়ালের ইঁট সরিয়ে উইল লুকিয়ে রাখেননি। তা ছাড়া দেখছ না, পুরো দেওয়ালটা সুন্দর ভাবে রঙ করা ? দেওয়ালের ভেতর কিছু লুকোনো থাকলে কিছু না কিছু চিহ্ন থাকবেই।"

আমি বললাম, "আর যদি ওঁরা জগৎনারায়ণের মৃত্যুর পর ঘরটা ফের রঙ করিয়ে থাকেন ?"

"সেটার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না অবশ্য। পরে দিগ্বিজয়কে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলেই চলবে। এখন অন্য জিনিসগুলো খুঁজে দেখা যাক।"

এরপর ঘন্টা দেড়েক ধরে আমি আর মেজকা বেশ আঁতিপাতি করে খুঁজলাম। ঘরে যে চেস্ট অব ড্রয়ারসখানা ছিল, তার প্রত্যেকটা ড্রয়ার খুঁজে দেখলাম আমি। সোফার পেছন, কুশনের তলা, খাটের গদি সরিয়ে দেখলেন মেজকা। আমি একটা চেয়ারে উঠে দরজা-জানালার পেলমেটের ওপর, দেওয়ালের ছবির পেছনে হাতড়ে দেখলাম। নেই।

রেড্ডি বললেন, "মূর্তিগুলো দ্যাখো রন্টু। আর ওই চাইনিজ ভাসের ভেতরটাও।"

পেতল ও ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলো এত ভারী যে, ওদের নড়াতে

আমারও হাঁফ ধরে গেল। একজন মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ যে ওগুলো নড়াতে পারবেন না, সেটা নিশ্চিত। বাকি রইল চাইনিজ ভাস। উঁচু লম্বা ভাসের ভেতর হাত ঢোকালাম অতিকষ্টে। কিন্তু না, ওটার ভেতর ধুলো বালি কিঞ্চিৎ রয়েছে বটে, কিন্তু উইল নেই।

রেড্ডি বললেন, "এবার ক্ষান্তি দাও তোমরা। খাওয়ার ডাক আসবে এক্ষুনি।"

রেড্ডির অনুমান ঠিক। মিনিট দশেক পর বেয়ারা ডাকতে এল আমাদের। পুল্লা রেড্ডি ওকে ডেকে বললেন, "শোনো ভাই, আমার কোমরটায় ব্যথা, আমার খাবারটা এ-ঘরে নিয়ে আসতে পারবে ?"

"জি হুজুর।"

"আচ্ছা, এ ঘরের মূর্তিগুলো ভারী সুন্দর। কিন্তু অন্য ঘরের তুলনায় দেখলাম জিনিসপত্র এ-ঘরে কম। রাজা জগৎনারায়ণ মারা গেলে পর ঘর থেকে জিনিসপত্র সরানো হয়েছে নিশ্চয়ই ..."

বেয়ারা প্রশ্নটায় কিছু হকচকিয়ে গিয়েছিল বোধহয়। দু'এক সেকেণ্ড রেড্ডির দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, "না হুজুর। এখানকার কোনও জিনিসই সরানো হয়নি। হিজ হাইনেস বেশি জিনিসপত্র দিয়ে জবরজং করতে চাইতেন না ঘরটাকে। অবশ্য এই ছবিটা নতুন আনা হয়েছে। এখানে আগে অন্য ছবি ছিল।" বলে একখানা পোর্ট্রেটের দিকে আঙুল তুলে দেখাল। দেখে মনে হল ওটি জগৎনারায়ণের পোর্ট্রেট।

রেড্ডি জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে যে ছবিটা ছিল সেটা কোথায় আছে ?"

"ওটা তো হলঘরে হুজুর," তারপর আমাদের দিকে ফিরে বলল, "বড়কুমার ও বহুরানি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।"

"চলো, যাচ্ছি।" বললেন মেজকা।

॥ ৩ ॥

পরদিন ভোরে বেড-টি'র দৌলতে বেশ তাড়াতাড়িই ঘুম ভেঙে গেল। চা খাওয়া শেষ করে মেজকা বললেন, "রন্টু, চলো, বাগানটায় একটু ঘুরে আসি।"

"চলো। কিন্তু রেড্ডিকাকু ?"

রেড্ডি বললেন, "কোমরে চোট পাওয়া রুগি মর্নিং ওয়াকে গিয়েছে শুনলে তক্ষুনি ঝাড়ি ফেরার টিকিট কাটিয়ে দেবে। তোমরা দু'জনে যাও বোস।"

ঘরে দরজা-টরজা বন্ধ করে থাকায় টের পাইনি, বাইরে এসে বুঝতে পারলাম শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। মেজকা বললেন, "রন্টু, একটু জগিং করলে শরীরটা গরম হবে।"

রাজবাড়ির লনটা খুব বড় নয়। তাতে কয়েকপাক জগিং করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু জিরোচ্ছি, এমন সময় ছড়ি দোলাতে-দোলাতে এলেন রণবিজয় সিং। পরেনে মিলিটারি শর্টস আর জার্সি। আমাদের দেখে ভুরু কুঁচকে বললেন, "আপনারা ?"

মেজকা বললেন, "একটু জগিং না করলে শরীরে জুত আসে না। তাই এসেছিলাম আর কি, ওপরে যাচ্ছি এখন। আয় রন্টু।"

আমরা চলে আসছিলাম, পেছন থেকে ডাকলেন রণবিজয়। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা ঠিক কী জন্য এখানে এসেছেন বলুন তো ?"

মেজকা বললেন, "কেন, পাখি দেখতে।"

"বিশ্বাস হয় না। পাখি দেখার জন্য অত টাকা খরচ করে তিন-তিনজনা চলে এসেছেন সেই কলকাতা থেকে ? আমার ভাইয়ের কাছ থেকে নেমন্তন্নই বা পেলেন কী করে ? আমার ভাইকে যে আপনারা আগে দেখেননি তার প্রমাণ তো আমিই পেয়েছি, যখন আমায় দিগ্বিজয় সিং বলে ডেকেছেন। ঠিক করে বলুন তো কী আপনাদের মতলব।"

ওঁর কথার ধরনে মনে হল চুরি-ডাকাতি করতে এসেছি আমরা।

মেজকা চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন, "চমৎকার প্রশ্ন তো ! আর আপনাদের নিমপুরের রাজবাড়ির আতিথেয়তারও বুঝি এই নমুনা ? গেস্টকে জিজ্ঞেস করা 'আপনার মতলবটা কী' ?"

দেখলাম রাগে মেজকার মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে। ভয় হল, স্থানকালপাত্র ভুলে ঘুষোঘুষি না শুরু করে দেন উনি। আমি তাই বলে উঠলাম, "আমাদের টিম লিডার পুল্লা রেড্ডি। আপনার যা জিজ্ঞেস করার ওঁকেই করবেন। চলো মেজকা।"

সব শুনে পুল্লা রেড্ডি বললেন, "আমার মনে হয় রণবিজয় আমাদের সন্দেহ করতে শুরু করেছেন। যা করবার, তাড়াতাড়ি করতে হবে।"

"দেখলাম তো সব কিছুই," আফসোসের সুরে বললেন মেজকা। "কিন্তু এত বড় খোলামেলা ঘরে বুড়ো যে কোথায় লুকোল উইলটা ..."

রেড্ডি বললেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উইলখানা এমন এক জায়গায় আছে, যেখানে চট করে কারুর নজরে পড়বে না অথচ রাখাটাও সহজ। আমাদের ভেবে বার করতে হবে কী হতে পারে সেই জায়গাটা।"

আমি বললাম, "এখান থেকে যে পেন্টিংটা সরানো হয়েছে, সেটা তো দেখা হল না রেড্ডিকাকু।"

"ওটা তো শুনলাম হলঘরে আছে।"

"দেখে আসছি আমি।"

হলঘরে এসে ছবিখানা বার করতে অসুবিধা হল না, কারণ অন্যান্য পোর্ট্রেটের মধ্যে এটাই শুধু ল্যাণ্ডস্কেপ।

"ভারী চমৎকার ছবিখানা তো ..." বলে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলাম ছবিটা। একজন বেয়ারা ওখানে ঝাড়পোঁছ করছিল, বলল, "নামিয়ে দিচ্ছি হুজুর, আলোয় দেখুন ..." বলে ছবিখানা নামিয়ে আমায় দিল।

ভালই হল। ছবির পেছন দিকটায় ভাল করে হাত বুলিয়ে দেখে নিলাম। না, কোনও কাগজ লুকোনো নেই এতে।

আমাদের ঘরে ফিরে দেখি, মেজকা উৎসাহে টগবগ করছেন। আমাকে দেখে বললেন, "শোন রন্টু, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। করিডর থেকে এ-ঘরে আসার দরজার ঠিক ওপরেই একটা কাঁচের পরি দেয়ালে আটকানো দেখেছিস তো ?"

"হ্যাঁ, দেখেছি। কিন্তু তাতে কী ?"

রেড্ডি বললেন, "ওটা আসলে একটা ফ্লাওয়ার ভাস। তবে সে-ভাবে ব্যবহৃত হয় না বোধহয়। বোস মনে করে, উইলখানা সেখানে থাকতে পারে।"

মেজকা বললেন, "ঘরে যখন নেই, তখন ওখানেই আছে। ঘর থেকে বার হয়ে ওখানে উইলখানা রাখা কয়েক মিনিটের ব্যাপার।"

আমি বললাম, "জগৎনারায়ণ যে বলে গেছেন উইলটা ঘরে আছে ?"

"আরে, দেওয়ালের এ-পিঠ আর ও-পিঠ। তফাত আর কতটুকু। তবে আমাদের পরিটাকে ভাল করে দেখতে হবে।"

"দাঁড়াও মেজকা, আসছি এক্ষুনি ..." বলে হলঘরে চলে এলাম। সেখানে বেয়ারাটা তখনও ঝাড়পোঁছ করছিল। ওকে ডেকে এনে বললাম, "এই পরিটা ভারী সুন্দর। আমার কাকা একটু দেখতে চাচ্ছেন। একটু নামিয়ে দেবে ?"

"নিশ্চয়ই," বলে কোথা থেকে একটা টুল এনে তার ওপর দাঁড়িয়ে সে নামিয়ে দিল পরিটা। তারপর বুকটা বেশ টান করে বলল, "পরিটা ভাল লাগবেই তো, রাজাবাহাদুর তো বিলেত থেকে এনেছিলেন এটা। দেখুন আপনারা, পরে আমায় বললে আবার উঠিয়ে দেব ওটা।" বলে নিজের কাজে চলে গেল।

"আমার কাছে দে ওটা," বলে মেজকা এগিয়ে এলেন। পেছন পেছন রেড্ডিও।

কিন্তু ও হরি, পরিটার মাথায় একটা গর্ত আছে অবিশ্যি, যাতে ফুল ঢোকানো যায়," কিন্তু সেটা এত সরু যে, তাতে হাত ঢোকানো অসম্ভব। "এখন উপায় ?" রেড্ডির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

মেজকা বললেন, "যা হবে তা হবে, এটার ভেতরটা আমি দেখবই," বলে আছড়ে মাটিতে ফেলে দিলেন পরিটাকে। ঝনঝন আওয়াজ করে চৌচির হয়ে গেল পরিটা।

সেই আওয়াজ পেয়ে "কী হল কী হল" বলে ছুটে এল বেয়ারাটা। এসেই পরির দশা দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসল।

সেই আওয়াজে ছুটে এলেন রণবিজয়ও।

উনি কোনও প্রশ্ন করার আগেই রেড্ডি এগিয়ে এসে বললেন, "পরিটা বোসের খুব ভাল লেগেছিল। নামিয়ে দেখতে গিয়ে হঠাৎ হাত থেকে পিছলে পড়ে গেল।"

অন্ধকার থমথমে মুখে রণবিজয় প্রশ্ন করলেন, "ওখানা নামাল কে ?"

দেখলাম ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে বেয়ারাটা কাঁপছে। বেচারার সাধের পরি তো গেলই, এখন আবার কী শাস্তি পায় কে জানে। এগিয়ে গিয়ে বললাম, "সরি, ওটা আমিই নামিয়েছিলাম।

রণবিজয় এভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন চোখের আগুনে ভস্ম করে দেবেন। তারপর বললেন, " আপনাদের আর কী কী ভাঙার প্ল্যান আছে।"

রেড্ডি বললেন, "আরে ছি ছি, কী বলছেন ? এটা একটা দুর্ঘটনা। এবং তার জন্য আমরা খুবই লজ্জিত। আমি চেষ্টা করব ওরকম আরেকটা পরি আপনার জন্য নিয়ে আনতে।"

"জিনিসটা ফরেন, ...মনে রাখবেন ..." বলে গটগট করে চলে গেলেন রণবিজয়।

এবার আমরা মেজকার দিকে তাকালাম। কাঁচুমাচু মুখ করে তিনি তাকিয়ে আছেন পরির টুকরোগুলির দিকে।

কেননা পরিটার ভেতর থেকে কোনও উইল বার হয়নি।

মেজকা বললেন, "সরি রেড্ডি। আমার কেন জানি মনে

হয়েছিল উইলটা এখানে নিশ্চয়ই পাব। মিছিমিছি গণ্ডগোল পাকালাম একটা।"

রেড্ডি মেজকার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "মনখারাপ কোরো না বোস। আমরা তো আর ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা নই। এক-আধটু ভুল সবারই হতে পারে। তবে এ-ব্যাপারটায় রণবিজয়ের সন্দেহটা আরেকটু বেড়ে গেল, এই যা।"

রণবিজয়ের সন্দেহ যে বেড়ে গেল তার প্রমাণ পেলাম সেদিনই।

সন্ধেবেলা একটু বোরড্ লাগাতে ভাবলাম নীচের লাইব্রেরি-ঘর থেকে একটা বই এনে পড়ি। লাইব্রেরি-ঘরে ঢুকেই একটা হাল্কা কাঠের পার্টিশন রয়েছে। আমি ঘরে ঢুকে আস্তে-আস্তে দরজা বন্ধ করতেই শুনতে পেলাম পার্টিশনের ওধারে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। রণবিজয়ের গলা কানে যেতেই চুপটি করে দাঁড়িয়ে গেলাম। শুনি কী বলেন।

"আমি নিশ্চিত যে, তোমার গেস্টদের মধ্যে কিছু গোলমাল আছে। এদের যা মনে করছ এরা তা নয় ..."

"না, না, আমি খুব ভাল রেফারেন্স পেয়েছি ..." দিগ্বিজয়ের গলা পেলাম আবার।

"রাখো তোমার রেফারেন্স। ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার মনে হচ্ছে। এদের মতলব ভাল নয়। বাড়িভর্তি কিউরিও। ওসব হাতাবার মতলব কি না কে জানে।"

"না, না, সে সব কিছু নয়।"

"কী করে জানো ? আজ সকালের ব্যাপারটা ..."

"ওটা নিশ্চয়ই একটা অ্যাকসিডেন্ট।"

"আমার বিশ্বাস হয় না। তা ছাড়া কোন্ বাড়িতে গেস্টরা দেওয়ালে সাজানো কিউরিও নামিয়ে দেখতে যায়—কোনও মতলব না থাকলে ? আমার মনে হয় পুলিশে খবর দেওয়া উচিত।"

"অসম্ভব," এবার দিগ্বিজয়ের গলাও খানিকটা চড়া, "আমার গেস্টদের বিরুদ্ধে কমপ্লেন করার কোনও অধিকার তোমার নেই।"

"আর তোমার গেস্টরা যদি আমার সম্পত্তি হাতায় তা হলে ? বাবার উইল অনুসারে এ-বাড়ির সব কিছুই আমার, সেটা ভুলে যাওনি আশা করি।"

"না, ভুলে যাইনি। তবে সে-উইল আমি চ্যালেঞ্জ করেছি মনে রেখো।"

লাইব্রেরি-ঘরের দরজা খুলে আমি পা টিপে-টিপে বাইরে চলে এলাম। রেড্ডি আর মেজকাকে কথাগুলো এক্ষুনি জানাতে হবে।

সব শুনে মেজকা বললেন, "রেড্ডি, পাততাড়ি গোটাও। দিগ্বিজয়ের প্রবলেম সল্‌ভ করতে গিয়ে শেষে থানাপুলিশ করতে না হয়।"

খানিক চিন্তা করে রেড্ডি বললেন, "হ্যাঁ, আমারও মনে হচ্ছে, এবার আমাদের ফিরে যাওয়াই উচিত। কিন্তু উইলখানা যে পাওয়া গেল না…"

মেজকা বললেন, "যদি বলো তো আজ রাতে ফের ঘরখানাকে তোলপাড় করে দেখি…"

"হ্যাঁ, তারপর রণবিজয় এসে হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিক আর কি। একটু চিন্তা করতে দাও।"

কিন্তু রেড্ডি আর চিন্তা করার সময় পেলেন না। একটু পরেই দরজায় টকটক শব্দ হল।

খুলে দেখি দিগ্বিজয়। গম্ভীর মুখ। উনি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর রেড্ডির দিকে চেয়ে বললেন, "মিঃ রেড্ডি, আমার ভাই কাল সকালে ডাক্তার আনবে, আপনার কোমর পরীক্ষা করার জন্যে…"

রেড্ডি শুয়ে ছিলেন। তড়াক করে উঠে বসে বললেন, "আমি তো ভাল হয়ে গেছি।"

দিগ্বিজয় এবার ফিক করে হেসে ফেললেন। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর ফের গম্ভীর হয়ে বললেন, "উইলটা তো আর পাওয়া গেল না। তাই না ?"

"পাওয়া যায়নি। আই অ্যাম ভেরি সরি মিঃ সিং…আপনার কাজটা করতে পারলাম না…"

একটুখানি চুপ করে রইলেন দিগ্বিজয় সিং। তারপর একটা নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "কী আর করা। সবই অদৃষ্ট। নইলে, রণবিজয়েরও বা এমন সন্দেহ বাতিক হবে কেন। যাক, আমার মনে হয়, আপনাদের এবার চলে যাওয়াই ভাল।"

"হ্যাঁ," বললেন পুল্লা রেড্ডি। "কালই আমরা চলে যেতে চাই।"

একটু ইতস্তত করে দিগ্বিজয় বললেন, "আপনাদের ফি'র ব্যাপারটা…"

বাধা দিয়ে রেড্ডি বললেন, " কাজে সফল না হলে ফি' নিই না আমরা। আর আসা-যাওয়ার খরচ তো দিয়েইছেন আপনি। তার ওপর নল-সরোবরটাও দেখা হয়ে গেল।"

"দেখা আর হল কোথায়, ফিরেই তো এলেন সেদিন…"

যাবার জন্য উঠে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন দিগ্বিজয়। "দি আইডিয়া ! কাল সকালে চলুন ভাল করে নল-সরোবর দেখিয়ে আনি আপনাদের। তারপর বিকেলে আমেদাবাদ রওনা হয়ে যেতে পারবেন। বম্বের ট্রেন ছাড়ে রাত দশটায়।"

॥ ৪ ॥

পরদিন ভোরে আমরা আবার রওনা হলাম নল-সরোবর। এবার স্নেহলতাও আমাদের সঙ্গে। ব্রেকফাস্টের ঝুড়িটা আরও বড়। তবে স্নেহলতা বলে দিয়েছেন, ব্রেকফাস্ট খাওয়া হবে নৌকোয় উঠে, আগে নয়।

মুড আমাদের কারুরই ভাল ছিল না। আজ পর্যন্ত যতগুলি কাজে গেছেন পুল্লা রেড্ডি, কোনওটাতেই অসফল হননি। এই প্রথম কাজ সমাধা না করেই আমরা ফিরে যাচ্ছি।

তবে এ-কথা বলতেই হবে যে, দিগ্বিজয় ও স্নেহলতা চমৎকার ব্যবহার করলেন। পুল্লা রেড্ডির অসাফল্যে আসল ক্ষতিগ্রস্ত তো হলেন ওঁরাই। কাজেই ওঁদেরই মনখারাপ হওয়ার কথা। কিন্তু সারাটা পথ ওঁরা হেসে গল্পগুজব করে গেলেন, উইলের কথা একবারও তুললেন না।

নৌকোয় উঠে যখন রওনা হলাম ও চারপাশে অসংখ্য সাইবেরিয়ান হাঁস, সারস, পেলিক্যান এসব দেখতে পেলাম, তখন পুল্লা রেড্ডি ওঁর ক্যামেরা খুলে ক্লিক-ক্লিক করে ছবি নিতে লাগলেন। ওঁর আনা নোটবুকে নোটও করলেন কী সব, স্নেহলতাকে জিজ্ঞেস করে। পাখিদের বিষয় দিগ্বিজয় ও স্নেহলতা দুজনেই বেশ জানেন শোনেন মনে হল। রেড্ডির ছবি তোলা ও নোট করা দেখে মনে হল ওঁর মুড কিছুটা

স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। মেজকা কিন্তু মুখ ভার করেই রইলেন। এমনকী ব্রেকফাস্টের প্লেট হাতে নিয়েও ওঁর মুখে হাসি ফুটল না। মনে হল রেড্ডির অসাফল্যে উনিই দুঃখিত হয়েছেন বেশি।

ফেরার পথে মেজকাকে সামনে বসিয়ে পুল্লা রেড্ডি জিপের পেছনের সিটে চলে গেলেন। তারপর ওঁর নোটবইখানা খুলে আবার কী সব নোট করতে লাগলেন।

মেজকা কিছুক্ষণ ধরেই উশখুশ করছিলেন। এবার বলে ফেললেন। "মিঃ সিং, একটা ব্যাপারে আপনার কাছে মাপ চাওয়ার আছে।"

"কী ব্যাপার ?"

"আপনাদের পরিটা আমি ভেঙেছি ইচ্ছে করেই। দেখতে চেয়েছিলাম ওটার ভেতরে উইলটা লুকনো আছে কি না। ভেরি সরি। ওই পরিটা আপনার বাবা কোন্ দেশ থেকে এনেছিলেন যদি বলেন তবে চেষ্টা করব একটা আনিয়ে দিতে।"

মেজকার কথায় দিগ্বিজয় সিং হোহো করে হেসে উঠে বললেন, "মিঃ বোস্, পরিটা ভাঙার জন্য উল্টে আপনাকেই আমার সার্ভিস চার্জ দেওয়া উচিত। বিচ্ছিরি লাগত আমার পরিটাকে। কিন্তু ভাঙতে সাহস পাইনি।"

মেজকার মুখে এতক্ষণে একটুখানি হাসি দেখা দিল। বললেন, "বাঁচালেন।"

পুল্লা রেড্ডি কিন্তু এদিকে নোট লিখেই চলেছেন। হঠাৎ লেখা বন্ধ করে বললেন, "মিঃ সিং, ব্ল্যাক আইবিস এই প্রথম দেখলাম আমি। ওদের সম্বন্ধে কিছু জানতে পারলে ভাল হত। কোনও বই রেকমেণ্ড করতে পারেন কি ?"

দিগ্বিজয় বললেন, "কেন, আপনারা যে ঘরে আছেন সেখানেই তো স্নেহলতার খানকয়েক বই রয়েছে, সবই বার্ড লাইফের ওপর। ও থেকেই ব্ল্যাক আইবিস সম্বন্ধে সব খবর পাবেন।"

পুল্লা রেড্ডি বললেন, "বই ? ও ঘরে তো কোনও বই নেই ?"

"কিন্তু ছিল তো !"

স্নেহলতা বললেন, "না, বাবা মারা গেলে পর ওগুলো আমার স্টাডিতে নিয়ে এসেছিল অর্জুন।"

"বইগুলো ও-ঘরে ছিল কেন ? রাজা জগৎনারায়ণ পড়তেন বুঝি ?"

"ঠিক পড়তেন নয়। শেষের দিকটা শুয়ে-শুয়ে ছবি দেখতেন। আসলে পাখিদের বিষয়ে ওঁরও খুব ইন্টারেস্ট ছিল তো। সলিম আলির সঙ্গেও ওঁর বন্ধুত্ব ছিল, জানেন ?" স্নেহলতা জবাব দিলেন।

পুল্লা রেড্ডি সশব্দে নিজের নোটবই বন্ধ করে বললেন, "মিঃ সিং, স্নেহলতা দেবী, আপনাদের ঠিক আশা দিচ্ছি না, তবে মনে হচ্ছে ওই বইগুলো না দেখলে আমাদের কাজ সম্পূর্ণ হবে না।" দেখলাম ওঁর গলার স্বরে উত্তেজনার আভাস।

দিগ্বিজয় বললেন, "তার মানে আপনি বলতে চান যে, বাবা ওই বইগুলোর একটার মধ্যেই উইলখানা লুকিয়ে রেখেছেন ?"

"অসম্ভব নয়।"

"ও মাই গড," স্নেহলতা বললেন, "আর গত ছ'মাস ধরে বইগুলো আমার স্টাডিতেই পড়ে আছে। খুলেও দেখিনি।"

রেড্ডি বললেন, "উইল যে ওখানে থাকবেই, সে-গ্যারান্টি দিতে পারছি না, তবে এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করলেই হয়।"

অবশ্য রেড্ডি বলার আগেই দারুণ জোরে জিপ ছুটিয়ে দিয়েছিলেন দিগ্বিজয় সিং। এত জোরে যে শেষে স্নেহলতা চেঁচামেচি করতে লাগলেন, "এই, হচ্ছেটা কী, সবাইকে হাসপাতালে পাঠাতে চাও নাকি ?"

বাড়ি পৌঁছে জিপ থেকে নেমেই দিগ্বিজয় বললেন, "চলুন, আপনাদের ঘরে।"

স্নেহলতা বললেন, "আমি বইগুলো নিয়ে আসছি।"

মেজকা আমাকে কানে-কানে বললেন, "রন্টু, তোর বুকটা ধুকধুক করছে না ?"

স্নেহলতা বইগুলো, নিয়ে আসতে রেড্ডি প্রথমে পাতাগুলো উল্টেপাল্টে দেখে নিলেন। কিছু পেলেন না। তারপর সবচেয়ে মোটা বইখানা হাতে নিলেন। ওটায় কার্ডবোর্ডের বাঁধাই, তার ওপর আর্ট পেপারে ছাপা কভার ও শেষে প্লাস্টিকের জ্যাকেট। মলাটে একটু হাত বুলিয়ে নিয়ে রেড্ডি দিগ্বিজয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "উইথ ইয়োর পারমিশন···" তারপর একটানে প্লাস্টিকের জ্যাকেট ও আর্ট পেপারের কভার খুলে নিলেন।

আর্ট পেপারের কভারের তলা থেকে বেরিয়ে এল একখানা কাগজ। হ্যাঁ, গুজরাতিতে লেখা। আর নীচের দিকে তিনটে সই। তার মধ্যে একটা ইংরিজিতে—মিস্ এমিলি রবার্টস।

কাগজখানা দিগ্বিজয়ের হাতে দিয়ে পুল্লা রেড্ডি হেসে বললেন, "অপারেশন সাকসেসফুল···" আর দিগ্বিজয় কাগজখানা স্নেহলতার হাতে দিয়ে রেড্ডিকে জড়িয়ে ধরে আহ্লাদে ঘুরপাক খেয়ে নিলেন বার কয়েক।

আমাদের ফেরার টিকিট করতে আগেই বলা হয়ে গিয়েছিল। তাই দিগ্বিজয় আর স্নেহলতার বিশেষ অনুরোধেও আর থেকে যাওয়া সম্ভব হল না।

আমেদাবাদ থেকে ট্রেন ছাড়লে রেড্ডি বললেন, "যাওয়া স্থগিত না-রেখে একদিক দিয়ে ভালই হল বোস। ওঁদের ঢালাও নেমন্তন্ন রয়েছে, আরেকবার সদ্ব্যবহার করা যাবে।"

মেজকা বললেন, "আবার রাজবাড়িতে ? রণবিজয় থাকবেন না তো ?"

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

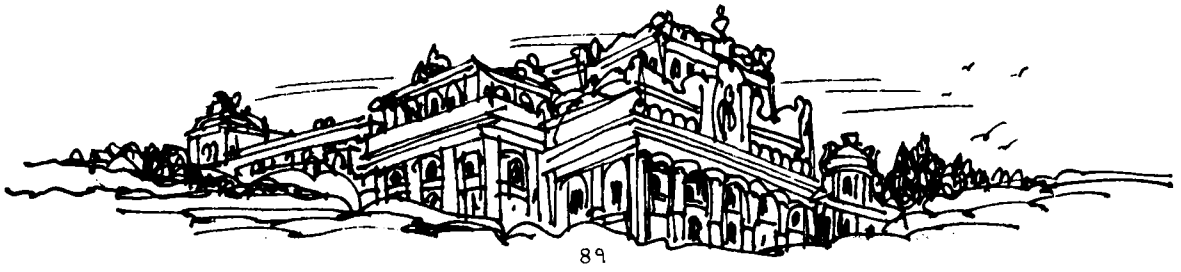

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদাশিব হৈ হৈ কাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

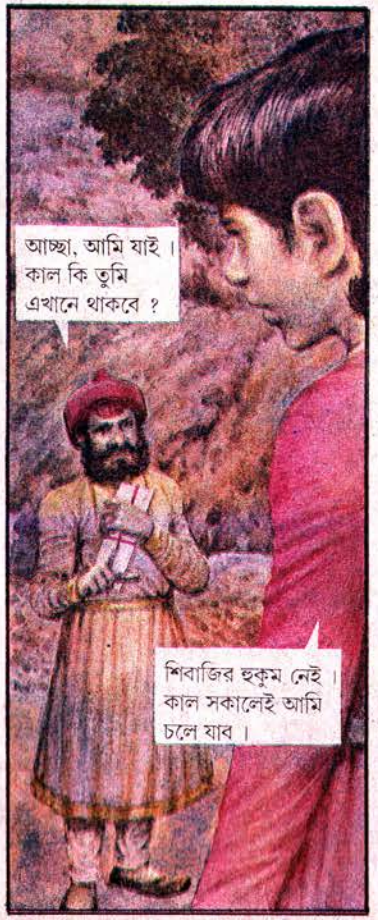

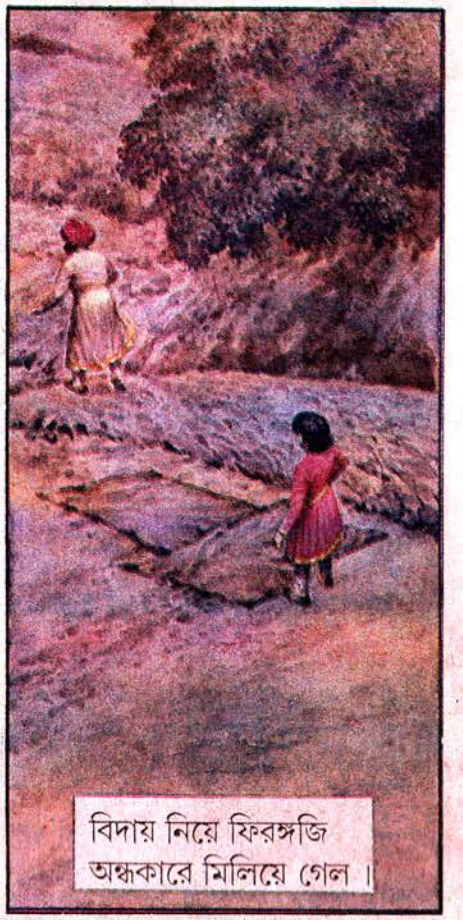

পরদিন ভোরে। তখনও সূর্য ওঠেনি।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

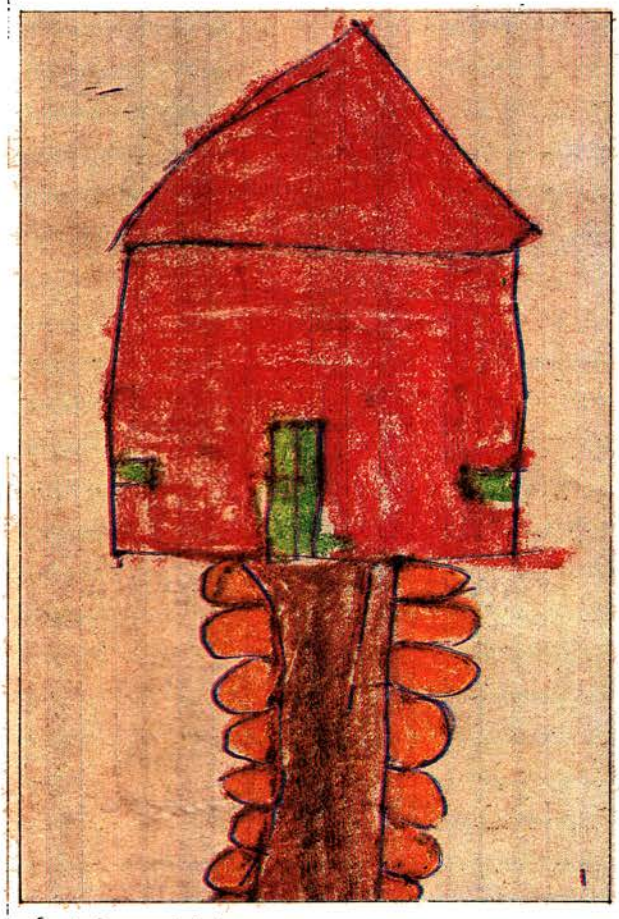

ছবি এঁকেছে **আকাশ মণ্ডল** (বয়স ৪)

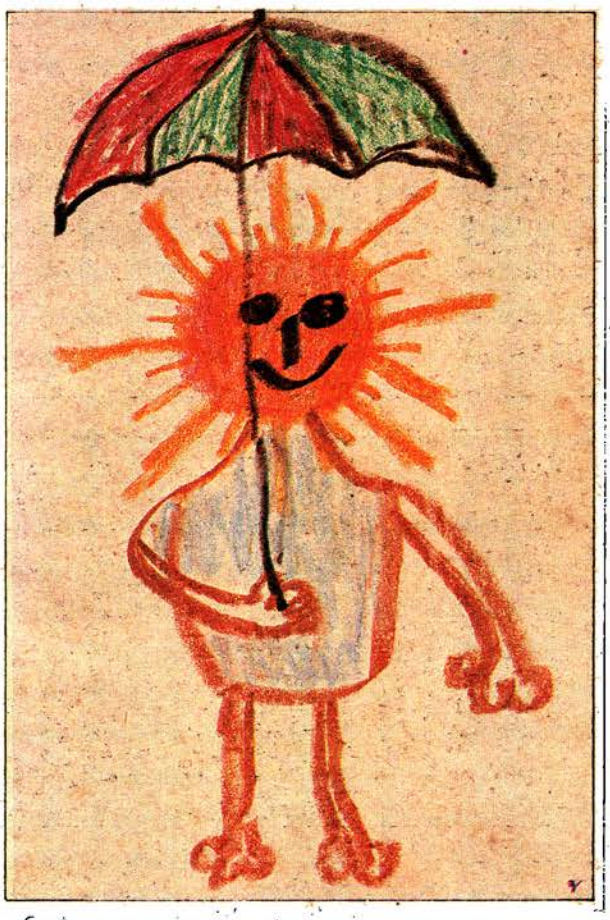

ছবি এঁকেছে **অতনু দত্তগুপ্ত** (বয়স ৫)

ছবি এঁকেছে **সন্দীপি চট্টোপাধ্যায়** (বয়স ৫)

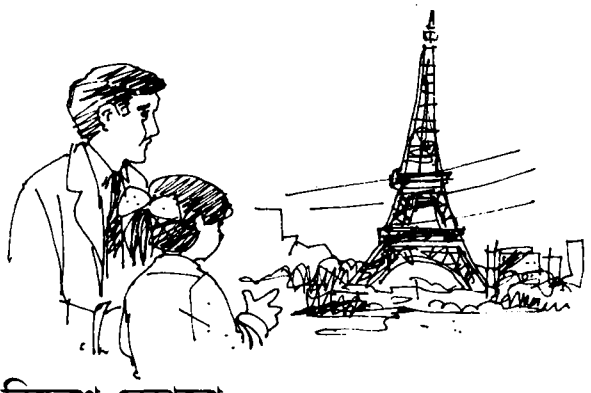

বিদেশে বেড়ানো

এ-বছর মার্চ মাসে হঠাৎই আমাদের বিদেশ যাওয়ার সুযোগ এসে গেল। বাবা লণ্ডনে গিয়েছিলেন কাজে। ওখানে বাবার কাজ শেষ হলে একদিন বিকেলে আই এ ফ্লাইটে আমি আর মা দিল্লি রওনা হলাম ও পালাম থেকে সেই রাতেই কে এল এম-এর ফ্লাইট ধরে আমস্টারডাম হয়ে লণ্ডনে পৌঁছলাম।

লণ্ডনে কী ঠাণ্ডা ! হিথ্‌রো এয়ারপোর্টে নেমে ঠাণ্ডায় যেন জমে গেলাম। মস্ত বড় এয়ারপোর্ট। প্রতি মিনিটে কত প্লেন উঠছে, নামছে। বাবা আমাদের নিতে এসে ছিলেন। আমরা লণ্ডনে তিন দিন ছিলাম। ওখানকার বিখ্যাত বিগ-বেন ঘড়ির কথা এতদিন শুনেছি ও গল্পে পড়েছি, সেটা দেখতে গেলাম। তারপর টেমস নদীর উপর টাওয়ার ব্রিজ, সেণ্ট পল্‌স চার্চ, মিউজিয়াম, হাইড পার্ক—এসব ঘুরে দেখলাম। পরের দিন টিউব ট্রেনে চেপে মাদাম তুসোর ওয়াক্স মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। সেখানে বিখ্যাত মানুষদের মোমের তৈরি মূর্তি এত সুন্দরভাবে সাজানো আছে যে, হঠাৎ দেখে সত্যিকারের মানুষ বলে ভুল হয়। ওই দিনই আমরা বাকিংহাম প্যালেস ও তার গার্ড বদল দেখলাম। পরদিন সকালে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি দেখতে গেলাম। সেখানে অনেক পুরনো প্রাসাদ ও চার্চ দেখলাম। বিকেলে লণ্ডন শহর ও দোকানপাট ঘুরতে গেলাম।

লণ্ডন থেকে আমস্টারডাম এসে আমরা দুদিন থাকলাম। তারপর উইণ্ডমিল, ডায়মণ্ড সেণ্টার—এইসব ঘুরে ঘুরে দেখলাম। ওখানে অনেক ক্যানাল আছে।

এবার প্লেনে চেপে রোমে এলাম। রোমে কত সুন্দর পুরনো দিনের ঘরবাড়ি আছে। আমরা ভ্যাটিকান সিটিতে গেলাম। সেখানকার চার্চে মহামান্য পোপ উপদেশ দিচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে আমাদের খুব আনন্দ হল।

রোম থেকে জার্মানি হয়ে ট্রেনে চেপে আমরা প্যারিস গেলাম। প্যারিসে বিখ্যাত আইফেল টাওয়ার, লুভর্ মিউজিয়াম দেখলাম। সিন্ নদীতে একদিন বোটে চেপে বেড়ালাম। প্যারিস খুব সুন্দর জায়গা।

আমাদের মিনি

আছে এক মিনি
খায় দুধ চিনি
মাঝে মাঝে খেতে চায়
মাছ আর মাংস
একদিন ধরেছিল
বড় এক হংস
চুপিচুপি ঘরে ঢোকে
আমাদের ভয়েতে
ফাঁক পেলে খেয়ে ফেলে
যাই থাক ঘরেতে

নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ১০)

আমরা আবার ট্রেনে করে জার্মানি ফিরে এলাম। সারব্রুকেনে দুদিন থাকলাম। তারপর কোলন্ বেড়াতে গেলাম। ওখান থেকে বন্ হয়ে ডুসেলডর্ফ গেলাম। ভীষণ ঠাণ্ডা ছিল ওখানে। ঘুরে ঘুরে দেখা হল। আমরা কোলন্ ফিরে এসে একদিন থেকে পরের দিন সুপারফাস্ট ট্রেনে করে ফ্রাঙ্কফুর্ট রওনা হলাম। এই ট্রেনটি খুব সুন্দর। অত যে স্পিডে চলছে একদম বোঝা যায় না। খুব ঝকঝকে ট্রেন। তেমনি সুন্দর বসবার আসন। মস্ত বড়-বড় পর্দা দেওয়া কাঁচের জানলা দিয়ে দুধারে পথের দৃশ্য চমৎকার দেখা যাচ্ছিল।

একদিকে উঁচু পাহাড়ের কোলে রাইন নদী বয়ে যাচ্ছে। বিরাট পাহাড়ের গায়ে চাষ হচ্ছে আর একদিকে অনেকটা সমান জায়গা। কী সুন্দর সব দৃশ্য। আমাদের ট্রেন তিনবার টানেলের মধ্যে দিয়ে পাস করল। এক সময় আমরা ফ্রাঙ্কফুর্ট পৌঁছে গেলাম। ওখানেও খুব ঠাণ্ডা। তার ওপর ঝিরঝিরে বৃষ্টি লেগেই ছিল। ওখানে কী বিরাট বিরাট বাড়ি। গার্ডেন, ফাউণ্টেন, চার্চ ইত্যাদি ওখানকার দ্রষ্টব্য যা কিছু সব ঘুরে ঘুরে দেখা হল।

ওখান থেকে ফ্রাঙ্কফুর্টে এলাম। পরের দিন আমরা সবাই দিল্লি রওনা হলাম। প্লেন থেকে বরফে ঢাকা আল্পস্ পর্বত দেখতে পেলাম। পরে দেখতে পেয়েছিলাম মস্কো শহর। সকালে পৌঁছে গেলাম দিল্লি।

শ্রীপর্ণা বিশ্বাস (বয়স ৭)

বুড়ো আঙুলের কথা

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হবার পর থেকে শার্লক হোম্‌সের কাছে যে সমস্ত 'কেস' সমাধানের জন্যে এসেছে তার মধ্যে কেবলমাত্র দুটো কেসের সন্ধান আমি জানি। একটা হল মিঃ হেদারলির বুড়ো আঙুলের সমস্যা, আর একটা হল কর্নেল ওয়ারবার্টনের পাগলামির রহস্য। কোনও রহস্যের সমাধান করতে গেলে যে ধরনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর প্রখর বিচারশক্তির দরকার পড়ে সেই দিক থেকে দেখলে ওয়ারবার্টন-সমস্যা বেশ জটিল আর রহস্যময়। তবে হেদারলির কাণ্ডটা একেবারে শুরু থেকেই এমন অদ্ভুত, আর যাকে খবরের কাগজের ভাষায় বলা যেতে পারে 'নাটকীয়', যে ওই ব্যাপারটাই আগে লিখব বলে ঠিক করেছি। তবে ওই ব্যাপারে তদন্ত করবার সময়ে হোম্‌স তার অসাধারণ বুদ্ধি, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আর বিশ্লেষণ শক্তির কোনওটাই খাটাবার বিশেষ কোনও সুযোগ পায়নি। হেদারলি-কাহিনী দৈনিক সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল। তবে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠার মাত্র আধকলমে সমস্ত ঘটনাটা এমন জোড়াতালি দিয়ে ছাপা হয়েছিল যে, তাতে আসল ঘটনাটা যে ঠিক কী ধরনের সে-কথাটা ভাল ভাবে বোঝা যায়নি। সমস্ত ঘটনাটা আস্তে-আস্তে ধাপে-ধাপে যেমন যেমন ঘটেছে সেটা যদি ঠিক পরপর পাঠকের চোখের সামনে ধরা যায়, মানে যেমন যেমন নতুন সূত্র পাওয়া গেছে তার সঙ্গে কী ভাবে তদন্তের ধারাটা বদলে যাচ্ছে, তা হলে মূল রহস্য আর রহস্য সমাধানের মজাটা পাঠক পুরোপুরি বুঝতে পারবে। ঘটনাটা আমাকে হতভম্ব করে দিয়েছিল। সে আজ বছর দুয়েক আগেকার কথা। কিন্তু এখনও ওই ঘটনাটার কথা ভাবলে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাই।

যে ঘটনাটার কথা আজ লিখতে বসেছি সেটা আমার বিয়ের অল্প কিছু দিন পরে ঘটেছিল। ১৮৮৯ সালের গরমকাল। আমি তখন আমাদের বেকার স্ট্রিটের বাসা ছেড়ে নতুন বাসায় এসে পুরোদমে প্রাইভেট প্র্যাকটিস আরম্ভ করে দিয়েছি। তবে ফুরসত পেলেই হয় পুরনো আস্তানায় আড্ডা দিতে যাই, না হয় তো হোম্‌সকে টেনে আনি আমার নতুন বাসায়। সত্যি কথা বলতে কী, অল্প দিনের মধ্যে আমার বেশ ভাল পশার জমে গেল। আমার বাসাটা প্যাডিংটনের কাছেই। আর তার ফলে আমার রোগীদের বেশির ভাগই রেলের চাকুরে। এদের মধ্যে একজনকে আমি একবার খুব কঠিন অসুখ থেকে সারিয়ে তুলি। আর তাতে সে আমার এমন ভক্ত হয়ে গেল যে, সুযোগ পেলেই যেখানে-সেখানে আমার ঢাক পিটিয়ে বেড়াত। আর তার চেনাজানা আধাচেনা লোককে প্রায় একরকম জোর করে চিকিৎসার জন্যে আমার কাছে পাকড়ে আনত।

সেদিন সকালে আমার ঘরের কাজের লোকটি শোবার ঘরের দরজায় টুকটুক করে টোকা দিতেই ঘুমটা ভেঙে গেল। কী ব্যাপার জিজ্ঞেস করাতে সে বললে যে, প্যাডিংটন থেকে দুজন লোক দেখা করতে এসেছে। তারা চেম্বারে বসে আছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম সাতটা, তখনও বাজেনি। রেলের কর্মচারী যখন ডাক্তার দেখাতে আসে তখন বুঝতে হবে ব্যাপারটা বেশ গুরুতর। তাই তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নীচে নেমে এলুম। নীচে নামতেই আমার পুরনো মক্কেলকে দেখতে পেলুম। দরজার সামনে সে পাহারাওলার মতো দাঁড়িয়ে আছে। লক্ষ করলুম চেম্বারের দরজা বন্ধ। সে তার ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে আমার চেম্বারটা দেখিয়ে দিয়ে আমাকে চুপিচুপি বললে, "আমিই ওকে এখানে নিয়ে এসেছি। এমনিতে লোকটাকে খারাপ বলে মনে হল না।"

"ব্যাপারটা কী?" আমি কৌতূহলী হয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলুম। ওর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল যে, সাধারণ মানুষ নয়, কোনও অদ্ভুত বিকটাকৃতি জন্তুকে ও কায়দা করে আমার চেম্বারে বন্দী করে ফেলেছে।

"একজন নতুন রুগি। আমি ভাবলুম ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসাই ভাল। না হলে ও হয়তো আপনার কাছে না এসে অন্য কোনও ডাক্তারের কাছে চলে যাবে। যাই হোক ওকে ভালয়-ভালয় এখানে হাজির করা গেছে।...আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আমি এখন চললুম। এখুনি আবার ডিউটি শুরু হয়ে যাবে।"

আমি তাকে কোনও কথা বলবার আগেই আমার ভক্ত দালালটি ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দরজা ঠেলে আমার চেম্বারে ঢুকলুম। একজন ভদ্রলোক টেবিলের উল্টো দিকের চেয়ারে বসে রয়েছেন। ভদ্রলোক ভাল হেদার টুইলের পোশাক পরে আছেন। তাঁর কাপড়ের টুপিটা আমার বইয়ের র‍্যাকের ওপর রাখা। ভদ্রলোকের একটা হাত রুমালে জড়ানো। রুমালে রক্তের দাগ। ভদ্রলোকের বয়েস কম। আমার মনে হল এঁর বয়েস খুব বেশি হলে গোটা পঁচিশ হবে। চেহারাটি বেশ শক্ত-সমর্থ। তবে তাঁর মুখটা দেখে মনে হল কেমন যেন ফ্যাকাশে, ম্লান। ভদ্রলোককে দেখে আমার মনে হল, যে-কোনও কারণেই হোক তিনি ভেতরে ভেতরে বেশ উত্তেজিত। জোর করে মনের সে ভাবকে চেপে রাখছেন।

আমাকে দেখে ভদ্রলোকটি বললেন, "ডাক্তারবাবু সাত-সকালে আপনাকে ঘুম থেকে তুললুম বলে মাপ চাইছি। কাল রাত্তিরে আমার একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। আমি আজ ভোরের ট্রেনে ফিরেছি। প্যাডিংটন স্টেশনে নেমে একজন ডাক্তারের খোঁজ করায় একটি লোক আমাকে আপনার কাছে নিয়ে এল। আপনার কাজের লোকটির হাতে আমার একটা 'কার্ড' দিয়েছিলুম। কিন্তু দেখছি যে, সে কার্ডটা এখানে টেবিলেই রেখে গেছে, আপনাকে দেয়নি।"

কার্ডটা তুলে নিয়ে চোখ বুলোলুম। লেখা রয়েছে : মিস্টার ভিক্টর হেদারলি। হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার। ১৬এ ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট (চার তলা)। আমার সত্যিকারের সাত-সকালের মক্কেলের পরিচয় পেলুম। নিজের চেয়ারটায় বসতে-বসতে

বললুম, "আপনাকে বসিয়ে রেখেছি বলে খারাপ লাগছে। আপনি সারারাত ট্রেন জার্নি করেছেন। বুঝতে পারছি বেশ কাহিল বোধ করছেন। তার ওপর রাত্তিরে ট্রেন জার্নি করার মতো বিচ্ছিরি ব্যাপার আর কিছু নেই।"

"না, কালকের রাতটা আমার মোটেই একঘেঁয়ে বা বৈচিত্র্যহীনভাবে কাটেনি।" কথা শেষ করেই ভদ্রলোক হাসতে শুরু করলেন। প্রথমটায় আমার মনে হল যে, ভদ্রলোকের হাসিটা বেশ দিলখোলা ধরনের। কিন্তু একটু পরেই বুঝলুম যে, হাসিটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। ভদ্রলোক টেনে-টেনে হাসতে লাগলেন। তিনি চেয়ারের ওপর এমন সাংঘাতিক ভাবে দুলতে লাগলেন যে, আমার ভয় হল উনি হয়তো গড়িয়ে পড়েই যাবেন। ব্যাপারটা বুঝতে আমার দেরি হল না।

"চুপ করুন," বেশ কড়া ভাবে ধমক লাগিয়ে বললুম, "একদম চুপ করুন!" তারপর আমি সোরাই থেকে এক গ্লাস জল গড়ালুম। আমার ধমকে কোনও কাজ হল না। ভদ্রলোক তখনও পাগলের মতো হেসেই চলেছেন। কোনও বিশেষ কারণে মন যদি খুব চঞ্চল বা উত্তেজিত হয় তখন নিজের মনকে শান্ত করতে গিয়ে অনেকে এই রকম পাগলের মতো কাণ্ড করেন। ডাক্তারি ভাষায় একেই বলে হিস্টিরিয়া। যাই হোক খানিক পরে ভদ্রলোক নিজে থেকেই চুপ করলেন। তাকিয়ে দেখলুম ভদ্রলোক নিজের এই আচরণে খুবই লজ্জা পেয়েছেন। আরও লক্ষ করলুম যে, তাঁর মুখে অসম্ভব ক্লান্তির ছাপ।

ভদ্রলোক আস্তে-আস্তে বললেন, "আমি নেহাতই পাগলামি করে ফেলেছি।"

আমি জবাব দিলুম, "না, না। আপনি এটা খেয়ে ফেলুন। ভাল লাগবে।" ভদ্রলোকের দিকে জলমেশানো ব্রাণ্ডির গ্লাসটা এগিয়ে দিলুম। ভদ্রলোক সেটা এক চুমুকে শেষ করে ফেললেন। তাঁর মুখ-চোখ অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

"আহ্।" ভদ্রলোক একটা আরামের নিশ্বাস ছাড়লেন। তারপর বললেন, "ডাক্তারবাবু, আমার বুড়ো আঙুলটা মানে যে জায়গায় আমার বুড়ো আঙুলটা ছিল সেটার অবস্থাটা দেখবেন কি?"

ভদ্রলোক রুমালটা খুলে নিয়ে হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। ডাক্তার হিসেবে আমি অনেক বীভৎস কাটা-ছেঁড়া দেখেছি। কিন্তু এখন যা দেখলুম তাতে আমি রীতিমত চমকে গেলুম। হাতের চেটো থেকে চারটে আঙুল বেরিয়ে আছে। বুড়ো আঙুলটা নেই। বুড়ো আঙুলের জায়গায় খানিকটা রক্ত জমে ডেলা পাকিয়ে গেছে। আমার মনে হল বুড়ো আঙুলটা কোনও ভাবে গোড়া থেকে উপড়ে গেছে।

"কী কাণ্ড! এ তো মারাত্মক জখম হয়েছে দেখছি। খুব রক্ত পড়েছে," আমি বললুম।

"হ্যাঁ, রক্ত খুব পড়েছে। ঘটনাটা যখন ঘটে তখন আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম। আমার মনে হয় বেশ কিছু সময় আমি অজ্ঞান অবস্থাতেই ছিলুম। জ্ঞান হলে দেখলুম যে, তখনও রক্ত পড়ছে। আর কিছু না করতে পেরে রক্ত বন্ধ করবার জন্যে পকেটের রুমাল বেশ করে ওই কাটা জায়গাটায় জড়িয়ে নিয়ে রুমালটা একটা কাঠের টুকরো দিয়ে বেশ শক্ত

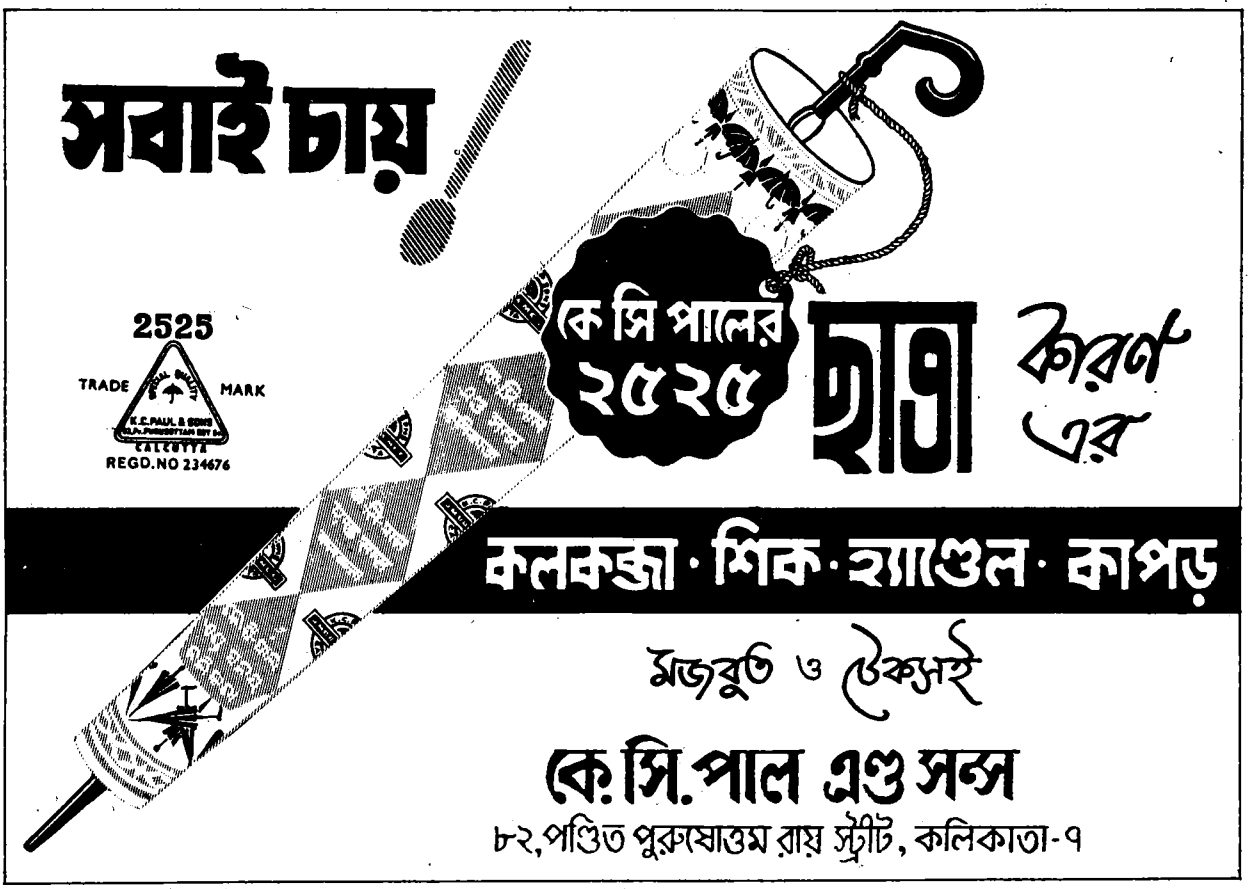

করে পেঁচিয়ে নিয়ে কবজির সঙ্গে বেঁধে নিলুম।"

"খুব ভাল করেছেন। আপনার তো মশাই ডাক্তার মানে সার্জেন হওয়া উচিত ছিল।"

"এটা আপনি বাড়িয়ে বলছেন। তবে এটাও তো একধরনের হাইড্রলিক্সের ব্যাপার, আর সেটা আমার আওতায় পড়ে।"

কাটা জায়গাটা ভাল করে দেখে আমি বললুম, "মনে হচ্ছে খুব ভারী অথচ ধারালো কোনও কিছুর আঘাতে আপনার আঙুলটা এইভাবে কেটে গেছে।"

"ভারী রামদা জাতের জিনিসের দ্বারা হয়েছে।"

"তা এরকম সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটল কী করে?"

"এটা তো কোনও অ্যাক্সিডেন্ট নয়!"

"তবে আপনি বলছেন আপনাকে কি কেউ মারতে এসেছিল?"

"হ্যাঁ।"

"আপনার কথায় আমার তো বেশ চিন্তা আর ভয় হচ্ছে।" এই কথা বলে আমি ভদ্রলোকের ক্ষতস্থানটা ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে বেশ ভাল করে ব্যাণ্ডেজ করে দিলুম। ভদ্রলোক চুপ করে বসে রইলেন। তবে তাঁর যে যন্ত্রণা হচ্ছে তা বুঝতে পারছিলুম। কেননা এক-একবার তিনি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরছিলেন। ব্যাণ্ডেজ করা হয়ে গেলে আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কী, এখন কেমন লাগছে?"

"দারুণ-। আপনার ব্রাণ্ডির গুণে আর ব্যাণ্ডেজের কায়দায় আমি যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছি। বিশ্বাস করুন, যে-রকম সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটেছিল তাতে আমি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ি..."

ওঁকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললুম, "দেখুন, এখন ওসব কথা আলোচনা না করাই ভাল। আপনার শরীর খারাপ হতে পারে।"

"না আমার শরীর খারাপ হবে না। তা ছাড়া সব কথা এক্ষুনি পুলিশকে জানাতে হবে। সত্যি কথা বলতে কী, আমার বুড়ো আঙুলটা উড়ে না গেলে পুলিশ বিশ্বাস করা তো দূরে থাক, আমার সব কথা ডাহা গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিত। কেননা আগাগোড়া ব্যাপারটা এমন অদ্ভুত যে, আজগুবি বলে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। সব চেয়ে বড় কথা যাকে প্রমাণ বলে সে-রকম কোনও কিছু আমার হাতে নেই। আসল সমস্যাটা কী জানেন, পুলিশ যদি আমার কথা বিশ্বাসও করে তা হলে আমার কাছ থেকে যতটুকু তারা জানতে পারবে তা এতই কম আর ভাসা-ভাসা যে, সেই সংবাদের উপর নির্ভর করে ব্যাপারটার ফয়সালা করা যাবে বলে মনে হয় না।"

আমি বললুম, "হুঁ। যদি আপনার এই সাংঘাতিক দুর্ঘটনার সঙ্গে কোনও রহস্যের গন্ধ থাকে আর সেই রহস্যের সমাধান যদি সত্যি সত্যি করতে চান তা হলে পুলিশের কাছে যাবার আগে আমার বন্ধু শার্লক হোম্সের কাছে আপনার যাওয়া উচিত।"

ভদ্রলোক বললেন, "হ্যাঁ, ওঁর নাম শুনেছি। উনি যদি আমার এ ব্যাপারে তদন্ত করতে রাজি হন তো আমি খুবই খুশি হব। তবে কী জানেন, পুলিশকে সব কথা বলব বলে আমি মনে মনে ঠিক করেছি। আপনি যদি মিঃ হোম্সকে একটা চিঠি লিখে দেন তো সেটা নিয়ে আমি দেখা করতে পারি।"

"না চিঠি দেব না। আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।"

"তা হলে আমি আপনার কাছে চিরকালের জন্যে ঋণী হয়ে থাকব।"

"বেশ। একটা গাড়ি ডাকাই। একসঙ্গে বেরনো যাবে। আশা করি আমরা ঠিক চায়ের সময়ে গিয়ে হাজির হতে পারব। কিন্তু আপনি কি যাতায়াতের ধকল সহ্য করতে পারবেন?"

"খুব পারব। আর তা ছাড়া সব কথা খুলে না বলতে পারলে আমার স্বস্তি হবে না।"

"ঠিক আছে। আমি গাড়ি ডাকতে লোক পাঠাচ্ছি। আপনি এই ঘরে একটু বসুন। আমি একবার ভেতর থেকে আসছি।" আমি ওপরে গিয়ে আমার স্ত্রীকে সব কথা খুলে বললুম। তারপর পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে গাড়ি ডাকিয়ে ভদ্রলোককে নিয়ে বেকার স্ট্রিটের দিকে রওনা হলুম।

শার্লক হোম্স এইসময় কী করে, আমার জানা ছিল। দেখলুম ঠিক তাই। হোম্স আরামকেদারায় বসে পাইপ টানছিল আর 'টাইমস্' পত্রিকার ব্যক্তিগত বিভাগের বিজ্ঞাপনগুলো মন দিয়ে পড়ছিল। আমাদের দেখে হোম্স খুব খুশি হয়েছে বলে মনে হল। সঙ্গে-সঙ্গে সে আমাদের জন্যে টোস্ট, ডিম আর চা আনাল। আমরা বেশ জমিয়ে প্রাতরাশ সারলুম। চা খাওয়া শেষ হলে হোম্স খুব যত্ন করে আমাদের সদ্য-পরিচিত বন্ধুটিকে একটা আরামকেদারায় বসিয়ে দিলে। তারপর তার মাথার কাছে একটা বালিশ গুঁজে দিলে, যাতে তার বসে থাকতে কষ্ট না হয়। হোম্স ভদ্রলোকের হাতের কাছে একটা তেপায়া ছোট টেবিলে জল আর ব্রাণ্ডি এনে রাখলে।

"বুঝতে পারছি মিঃ হেদারলি, আপনার ওপর দিয়ে খুব বড় রকমের ঝড়ঝাপটা গেছে। এটাতে আরাম করে বসুন। এটা আপনার নিজের বাড়ি বলে মনে করবেন। তারপর ধীরেসুস্থে আপনার সব কথা আমাকে খুলে বলুন। তবে হ্যাঁ, যখনই ক্লান্ত বোধ করবেন তখনই চুপ করে বিশ্রাম নেবেন, যতক্ষণ না বেশ চাঙ্গা বোধ করেন। আর এই ব্রাণ্ডি দু-এক চুমুক করে খেলে আপনি একটু বল পাবেন।"

"অনেক ধন্যবাদ মিঃ হোম্স। ডাঃ ওয়াটসন কাটা জায়গাটা ব্যাণ্ডেজ করে দেবার পরই আমার অর্ধেক দুর্বলতা চলে গিয়েছিল। আর এখন আপনার এখানে পেটপুরে প্রাতরাশ করে আমি পুরোদস্তুর 'ফিট্'। আমি জানি আপনার সময়ের দাম আছে, তাই বেশি সময় নেব না। একেবারে আসল কথায় আসি।"

হোম্স তার নিজস্ব আরামকেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসল। যারা হোম্সকে চেনে না তারা হোম্সকে এই রকম ভাবে দেখলে ভাববে যে, সে নির্ঘাত ঘুমুচ্ছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা ঠিক উলটো। বিপুল আগ্রহে সে তার মক্কেলের প্রত্যেকটি কথা শুনছে, বিচার করছে, বিশ্লেষণ করছে। আমি হোম্সের উলটো দিকের একটা চেয়ার দখল করলুম। হেদারলি বলতে শুরু করলে। আমরা শুনতে লাগলুম। (ক্রমশ)

অনুবাদ সুভদ্রকুমার সেন

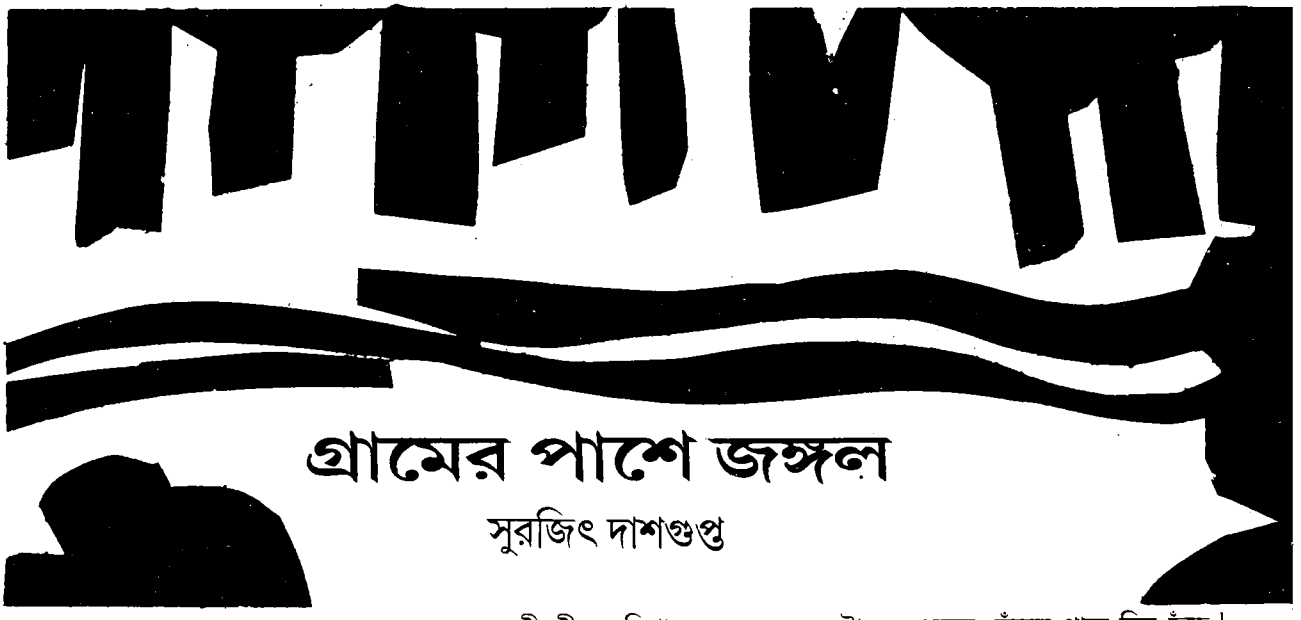

গ্রামের পাশে জঙ্গল

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

এক ধারে গ্রাম, অন্য ধারে জঙ্গল, মাঝখানে নদী নীল আকাশের ছায়া বুকে নিয়ে সারদিন বয়ে যায়। জঙ্গলের পেছনে কতকালের পুরনো গাঢ়-নীল পাহাড়ের বিরাট কাঁধ, মাথায় তুষারের মুকুট, তাতে কখনও সিঁদুরি কখনও বেগুনি আভা খেলে।

বর্ষায় পাহাড়ে ঢল নামে, শান্ত নদী অশান্ত হয়ে ওঠে তখন। তা ছাড়া সারা বছর নদীতে যেটুকু জল থাকে তাতে গ্রামের মানুষ ছপছপ করে পায়ে হেঁটেই নদী পেরিয়ে জঙ্গলে যায় জ্বালানির জন্যে শুকনো কাটিকুটো কুড়োতে, মরসুমে সরকারি পারমিটে মৌমাছির চাক ভেঙে বনের মধু আনতে।

জঙ্গলের জানোয়ারও মাঝে-মধ্যে গাঁয়ে আসে। ধান পাকার সময় হাতির পাল আসে, এক-একসময় দাঁতাল শুয়োর আসে। তখন ঢোল-ক্যানেস্তারা পিটিয়ে, বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে, মশাল জ্বেলে বিরাট হল্লা করে গাঁয়ের মানুষ জানোয়ার তাড়ায়। হঠাৎ কখনও বাঘামামাও গ্রাম বেড়াতে আসেন, কখনও বা ছাগলটা বাছুরটা তুলে নিয়ে যান, আবার কখনও কিছু না নিয়েও পায়ের ছাপ রেখে যান।

আর সবাই আসে রাতের আঁধারে, কালামানিক আসে দিনের আলোতে। কালামানিক হল এক-শিং-ওয়ালা একটা বিরাট গণ্ডার। দূর থেকে মাঠ পেরিয়ে কালামানিককে আসতে দেখলেই গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা 'আলছে আলছে' করে আনন্দে সোরগোল তোলে। তার সারা গায়ে দুনিয়ার যত আহ্লাদ গলে পড়তে পড়তে জমে পাথর হয়ে গেছে। কিন্তু গণ্ডারটার হৃদয়খানি কালোজামের শাঁসের মতো নরম। বাড়ি-বাড়ি ঘুরে কালামানিক ঝিঙেটা কুমড়োটা কাঁঠালটা খেয়ে বেড়াবে, গামলায় আহ্লাদী নাক ডুবিয়ে ফ্যান খাবে, তবে তার সবচেয়ে ভালবাসার জিনিস হচ্ছে পান্তা ভাত, তাতে একটু নুন আর এক খাবলা গুড়—বাস, লম্বা জিভটা দিয়ে সব চেটেপুটে খাবে।

এভাবে শান্ত নদীটির এপারে গ্রামের মানুষ গ্রামে আর নদীর ওপারে জঙ্গলের জানোয়ার জঙ্গলে সুখে-শান্তিতে বাস করে।

একদিন দুপুরবেলা গাঁয়ের মানুষ খাওয়াদাওয়া সেরে বিশ্রাম করছে। কয়েকটা ছেলেমেয়ে তেঁতুল গাছে ঢিল ছুঁড়ে তেঁতুল পাড়ার চেষ্টা করছে, কয়েকটা ছেলেমেয়ে পাকুড় গাছের ডালে টাঙানো দোলনায় দুলছে, কয়েকটা ছেলে গাছের ছায়া থেকে রোদ্দুরে আবার রোদ্দুর থেকে ছায়ায় ডাংগুলি খেলছে।

এমন সময় দূরে জেগে উঠল একটা ভটভট আওয়াজ। কিসের আওয়াজ রে? গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের কাছে আওয়াজটা অচেনা। বড়দের মধ্যে যারা শহরে-টহরে গেছে তারা চেনে। এই দুপুরের আধো-তন্দ্রার মধ্যে মোটর-সাইকেলের ভটভট আওয়াজটা চিনতে পেরে তারাও অবাক।

কে? কারা? কেন?

ভটভটে সাইকেলে চড়ে দুজন লোক তেঁতুল গাছটার দিকেই এগিয়ে আসছে। রোদ্দুরে পোড়া মুখ, চোখে কালো চশমা, পিঠে বন্দুক বাঁধা, পায়ে বুটজুতো। গাছের ছায়ার নীচে ভটভটিয়া থামিয়ে দুদিকে দু-পা ফাঁক করে মাটিতে রেখে লোকদুটো একবার চারদিকটা দেখে নিল।

গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা খেলা ভুলে দূরে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে নতুন অতিথি দুজনকে দেখছে, তাদের চোখে খানিকটা ভয়-পাওয়া, খানিকটা অবাক হওয়া।

সামনের সাহেব জিজ্ঞেস করল, "এটাই তো বানগুড়ি গ্রাম?"

ছেলেমেয়েরা মাথা হেলিয়ে 'হ্যাঁ' জানাল।

"শুনেছি, বানগুড়ির মানুষ জঙ্গলের জানোয়ারকে ভয় করে না। তোরা দেখছি, মানুষ দেখেই আধমরা!" বলে ভটভটে থেকে নেমে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল ওদের দিকে। "কী নাম তোর?"

"উভারু।"

"আর তোর?"

"রাজা।"

"একেবারে রাজা? বানগুড়ির রাখালরাজা? হা-হা-হা-হা।" হঠাৎ বিশাল হাসিটাকে গপ করে গিলে ফেলে লোকটা বলল, "যা, গাঁয়ের বুড়োদের ডেকে আন। বল গে,

এবার বানগুড়ির আসল রাজারা এসেছে, খাজনা, ভোজন চাই, ভেট চাই।" তার পরেই এক হুঙ্কার, "যা, ডেকে আন।"

সেই হুঙ্কারে গাছে গাছে কাকেরা কা-কা করে ডানা ঝাপটে উঠল।

ছেলেমেয়েদের যেতে হল না। গ্রামের বয়স্ক মাতব্বর-মানুষরা ভটভটিয়ার আওয়াজ থেমে যাওয়ার জায়গাটা ঠাহর করে নিজেরাই এসে হাজির। ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে তারা বলল, "যা, তোরা সাহেবদের নাগে চিয়ার লিয়ে আয়। জলদি যাবি, জলদি আলবি।"

সব ছেলেমেয়ে চলে গেল দূরে, শুধু রাজা বুকের উপর দুটো হাত আড়াআড়ি করে তেঁতুল গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

শুধু চেয়ার না, চেয়ারের সঙ্গে এক কলসি ঠাণ্ডা জল। খুশি হল সাহেব দুজন। চোখেমুখে জল দিয়ে আঁজলা করে জল খেয়ে বসল চেয়ারে।

তেঁতুলগাছে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা রাজার দিকে তাকিয়ে বলল, "আজ থেকে আমরা রাজা, এই আমাদের সিংহাসন! বুঝলি বানগুড়ির রাখালরাজা?" এবার কালো চশমা পরে নিয়ে গাঁয়ের লোকেদের দিকে মুখ ফেরাল। "তোদের এই গাঁয়ে জঙ্গলের গণ্ডার, হাতি নাকি পোষা গরুমোষের মতো ঘুরে বেড়ায়?"

গ্রামবাসীরা এ ওর মুখের দিকে তাকাল। কী উত্তর দেওয়া ঠিক হবে? একজন বলল, "জঙ্গলের টারে গাঁই, জানোয়ার তো আলবাই।"

"বাস, বাস। গাঁয়ে জানোয়ার এলেই হল। শোন, আমরা এখানে থাকব—থাকব, খাব। থাকার একটা ভালো জায়গা চাই, বিছানাও চাই। দেখছিস তো, এই বন্দুকদুটো, এক বাক্স গুলি আর এই মোটর-সাইকেল—আর কিছু নেই আমাদের, সব দিতে হবে তোদেরকে।"

একজন সাহস করে জিজ্ঞেস করল, "কুথা থেকে আলছান তুমরা?"

হা-হা করে হেসে উঠল সাহেব দুজন। "হিম্মত আছে দেখছি। কী নাম তোর?"

লোকটি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "গুপাল—গুপাল সিং।"

"ঠিক হ্যায়। হিম্মতওয়ালাও আমাদের চাই। তুই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবি, আমাদের সব কাজকর্ম করবি—টাকা পাবি।"

অন্য সাহেবটা বলল, "আমরা গোর খাটাই না, মজুরি দিই।"

সেই থেকে ভটভটিয়ার সাহেবদুজন গাঁয়ে মৌরসিপাট্টা গেড়ে বসল। আর গোপাল সিং বহাল হল তাদের ফরমাশ খাটার কাজে।

প্রথম দুচারদিন গোপালকে সঙ্গে নিয়ে সাহেব দুজন জঙ্গলটা শুধু পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াল। জঙ্গলের ভেতর কোথায় নালা, কোথায় জলা, কোন্ পথে হাতিরা চলা-ফেরা করে, গণ্ডাররা কোথায় যায়, কোথায় হরিণরা চরে, কোথায় লম্বা-লম্বা ঘাস আছে, কোথায় খানিকটা ফাঁকা আছে, কোথায় ঝরনা আছে, এসব গোপালের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তারা ভাল করে জেনে নিল।

কিন্তু ওদের ব্যাপার-স্যাপার গোপাল কিছুই বুঝতে পারে না। ওরা কারা, কেন এসেছে, জঙ্গলের এত সব হদিশ-তালাশে ওদের কী দরকার—সবই ধাঁধা। শুধু যে ঘুরে বেড়ায় তা নয়, গাঁয়ে ফিরে আবার তার নকশা আঁকে। সাহেব দুটোর মামলাটা কী?

তারপর একদিন বড়সাহেব বলল, "বাস, গোপাল, আর তোকে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরাব না। এবার তোর জঙ্গল থেকে ছুটি।"

গোপাল ভাবল, এবার বুঝি সাহেবরা ভটভটিয়া চড়ে শহরে ফিরে যাবে।

কিন্তু গেল না তো! বরং একটা দিন শুধু ঘরে থেকে পড়ে পড়ে ঘুমোল। দিনের শেষে যখন উত্তরের আকাশে সাজানো দূরের পাহাড়ের মাথায় বেগুনি সন্ধ্যা নামল তখন সাহেব দুজন কোমরে টর্চ আর হাতে বন্দুক নিয়ে গোপালকে পেছনে ফেলে নদীর দিকে চলে গেল।

ত্বকের সংক্রমণ যেমনি অস্বস্তিকর ও বিরক্তিকর তেমনি বিচ্ছিরি

প্র্যাগমেটর কাজ করে চারভাবে, তাই সংক্রমণ দূর করে ও চটপট সারিয়ে তোলে।

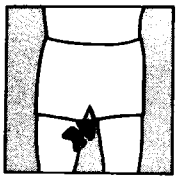

ধোবিজ ইচ্—সংক্রামিত কাপড়চোপড় থেকে হয়। 'প্র্যাগমেটর' ব্যবহার করে সারিয়ে তুলুন।

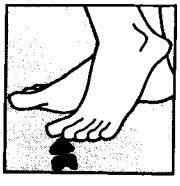

হাজা—ভেজা পায়ে হতে চায়। দ্রুত আরাম পেতে 'প্র্যাগমেটর' লাগান।

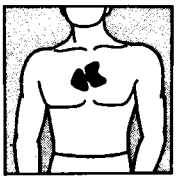

দাদ—শরীরের যে-কোনো জায়গাতেই হতে পারে। অবহেলা করবেন না—উপশমের জন্যে 'প্র্যাগমেটর' ব্যবহার করুন।

স্বাস্থ্যবিধি না মেনে চললে অথবা সংক্রামিত কাপড়চোপড় থেকে এধরণের ছত্রাকজনিত ত্বকের সংক্রমণ হতে পারে—যে-কোনো সময়েই। প্র্যাগমেটর চারভাবে কাজ করে বলে এসব বালাই দূর হয়ে যায়। ডাক্তাররাও তাই প্র্যাগমেটরই ব্যবহার করতে বলেন।

তাড়াতাড়ি ত্বকে ঢোকে
'প্র্যাগমেটর' তাড়াতাড়ি ত্বকে ঢুকে সংক্রামিত জায়গায় ও তার চার পাশে কাজ শুরু করে দেয়।

ভালভাবে সংক্রমণমুক্ত করে
'প্র্যাগমেটর' সংক্রামিত ত্বক সারিয়ে দেয় এবং ভালভাবে সংক্রমণমুক্ত করে দিয়ে ত্বকের স্বাস্থ্য ফেরায়।

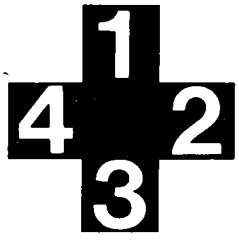

চটপট চুলকানি বন্ধ করে
'প্র্যাগমেটরে' সংক্রামিত জায়গা আঁচড়ানোর ইচ্ছেকে প্রশমিত করে তাই সংক্রমণও ছড়াতে পারে না।

ছত্রাকজনিক সংক্রামণ রোধে
'প্র্যাগমেটরে' আছে সুপরিচিত ও কার্যকর ছত্রাক-প্রতিরোধী জিনিষ গন্ধক যা গুঁড়ো আকারে থাকায় সংক্রামিত জায়গায় আরো ভালভাবে লাগে।

আয়োডেক্স নির্মাতাদের তৈরি

1148 BEN

PRAGMATAR®
Ointment of Cetyl Alcohol, Cetyl Tar Distillate, Sulphur and Salicylic Acid 28g.

'প্র্যাগমেটর' মানেই হাতের কাছে দ্রুত আরাম

SKF —AN ESKAYEF PRODUCT

© Eskayef Limited

কয়েকটা দিন পরে সন্ধেটা ফাঁকা পেয়ে গোপাল বাড়ি ফিরে এল। তার বৌ দাওয়ার একটেরে কাঠের উনুনে রাতের খাবার রাঁধছে আর সেই আগুনের আভাতে দেখা যাচ্ছে, দাওয়ার অন্যটেরে অনেক ছেলেমেয়ে বসে গোপালের বাবার কাছে গল্প শুনছে। এই একই গল্প গোপাল সেই ছোটবেলা থেকে কতজনের মুখে হাজার বার শুনেছে তার ইয়ত্তা নেই।

অনেককাল আগে দেবতাদের আকাশেই মানুষরাও থাকত। নীচের পৃথিবীতে থাকত জন্তু-জানোয়ার। আকাশ থেকে সিঁড়ি বেয়ে এক-একদিন মানুষ আসত পৃথিবীতে, আবার ফিরে যেত আকাশে। কিন্তু একদিন সবাই আকাশে ফিরে গেলেও একজন মানুষ গেল না। এভাবে পরপর সাতদিন যখন সাতজন মানুষ পৃথিবীতে থেকে গেল তখন দেবতাদের রাজা ভীষণ রেগে আকাশ আর পৃথিবীর মধ্যেকার সিঁড়িটা ভেঙে ফেললেন।

অমনই দূরের জঙ্গলে দুমদুম শব্দ। চমকে উঠল সবাই। এ আবার কিসের শব্দ? তারা-ভরা আকাশের নীচে ঘুম-ভরা পৃথিবীর শান্তি ভেঙে গেল কেন? ঘুমন্ত পাখিরা ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল কেন? গাঁয়ের কুকুরগুলো হঠাৎ খেপে গিয়ে চেঁচামেচি শুরু করল কেন?

আবার সব চুপ। পৃথিবীর ভেঙে যাওয়া শান্তি আবার জুড়ে যায়। ডালপালা ছড়িয়ে বেড়ে ওঠে রাত। পশুপাখি আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, মানুষের সংসারও ঘুমিয়ে পড়ে আস্তে আস্তে। ঘুমের ঘোরে কেউ হয়তো দুমদুম শব্দ শুনেছে এক-আধবার, ভেবেছে অন্য কোনও আকাশে মেঘ ডাকছে। কেউ হয়তো পাখিদের ডানা ঝাপটানি আর কুকুরের চিৎকার শুনে ভেবেছে অন্য কোনও গ্রামে উৎপাত ঘটছে।

কিন্তু দুদিনের মধ্যেই গাঁয়ের সকলে জেনে ফেলল, রাতের বেলা জঙ্গলের ভেতরে দুমদুম শব্দ ওই সাহেব দুজনের বন্দুকের শব্দ। সারা রাত ধরে জঙ্গলে তারা জন্তু-জানোয়ার মারে। ব্যাপারটা গাঁয়ের লোকদের মোটে পছন্দ নয়। গাঁয়ের ওই অপছন্দের কথাটা একদিন সকালে চা দেওয়ার সময় সাহেবদের কানে গোপাল পৌঁছে দিল।

ছোটসাহেব বন্দুকের নল খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল, "কেন? জানোয়ার মারা কি দোষের?"

"দুষ লাই? জানোয়ারগুলা তো মানুষার কুনো ক্ষাতি করে লাই, তাইলে কাঁয় মারবা?" জানতে চাইল গোপাল।

বিছানায় বসে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বড়সাহেব বলল, "তোরাও তো মারিস, মাছ মারিস—মুরগি, পায়রা, পাঁঠা—মারিস না তোরা?"

ঝাঁটা নিয়ে ঘর ঝাঁট শুরু করে গোপাল বলল, "সি খাবার নাগে মারি। তুমরা কি বাঘ হাতি খায়েন?"

ছোটসাহেব হেসে বলল, "বুদ্ধুরাম। বাঘ হাতি কেউ খায়?"

একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বড়সাহেব বলল, "বাঘের চামড়া, হাতির দাঁত, গণ্ডারের শিং বিক্রি করে খাই—বিক্রির টাকায় খাই।"

ঘর ঝাঁট দিতে দিতে গোপাল মাথা নাড়ে। "লাই, ঠিক লাই। টাকার নাগে মারছান বটে, কিন্তু টাকা তো খায়েন লাই। চাউল তেইল লবণ খায়েন। বাকি টাকা দিয়া গাড়িজুতা খরিদান, ফুর্তিমজা খরিদান, তার নাগেই জন্তু-জানোয়ার

বলিদান। ইটা কি কুনো বিচার ?"

"চুপ কর, মস্ত বিচার করনেওয়ালা এসেছে," ধমকে উঠল ছোটসাহেব।

গোপালও নাছোড়বান্দা। বলল, "মুই কাঁয় বিচার করব ? তুমরা দ্যাশের বড়-বড় মানষা হন, তুমরাই বিচার করান।"

এবার বড়সাহেব বিছানা থেকে উঠে এসে গোপালের সামনে দাঁড়াল।

ঝাঁট দেওয়া বন্ধ রেখে মুখ তুলে তাকাল গোপাল।

দাঁতে দাঁত ঘষে বড়সাহেব বলল, "ব্যাটা নেমকহারাম, টাকা খাচ্ছিস না আমাদের ?"

উঠে দাঁড়াল গোপাল—আস্তে আস্তে। বলল, "খাইছি, কিন্তুক আর খাইম না।"

"খাইস না ! তোর বাপ খাবে," বলে দাঁত বের করে হাসার ভাব করল বড়সাহেব। চোখের ভুরু নাচিয়ে বলল, "কী খাওয়াবি বাপকে—টাকা, না গুলি ?"

রাগে ফুলতে লাগল গোপাল। কিন্তু সে তো নিরুপায়। ওদের আছে বন্দুক, আছে টাকা, আছে নানা যোগসাজস। তার কী আছে ? তার ক্ষমতা কতটুকু ? আবার বসে পড়ে গোপাল ঝাঁটাটা কুড়িয়ে নিল।

গ্রামের সব মানুষের একই অবস্থা। এক যদি লোকদুটোর কথা সরকারকে জানালে কোনও কাজ হয়। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে ! চৌকিদার সাফ বলে দিল, ওসব কাজ তাকে দিয়ে হবে না। সাহেবদের কোথায় কী ক্ষমতা থাকে না থাকে কে জানে। হয় তার চাকরিটা যাবে, নয় তার প্রাণটা যাবে।

মাস-কাবারে ব্লক আপিসে চৌকিদারকে যেতে হয় মাইনে আনতে। পরনে খাকি প্যান্ট-শার্ট, কোমরের বেল্টে চকচকে পেতলের নম্বর, পকেটে নগদ টাকা, হাতে বল্লম। এই গাঁয়ে সে-ই সরকার বাহাদুরের নিজের লোক, যাকে বলে খাস লোক।

গাঁয়ের মুখে রাস্তার ধারে জলপাই হিজল কদম কাঁঠাল চার বন্ধু-গাছের একটা আড্ডা, পেছনে বিরাট বাঁশঝাড়। এখানটা তাই দিনের বেলাতেও ছায়ায় ছায়ায় ঠাণ্ডা। অনেকটা পথ চড়া রোদ্দুরে হেঁটে এসে গাঁয়ের ছায়ায় পৌঁছে যাওয়ার সুখে চৌকিদার গান ধরল, "ও তর গে মালিকাও, ও তর টাকা খাওয়া মুখত দেছি পূজাও—"

গাইতে গাইতে জলপাই কদম গাছদুটোর ফাঁকে চোখ পড়তেই থেমে গেল। গাছদুটোর আড়ালে একটা দাঁতাল হাতির মস্ত মাথা। ছোট-ছোট চোখদুটি চৌকিদারের দিকে তাকিয়ে। কুলোর মতো কানটা বাতাসে দুলছে অল্প-অল্প, তার মাঝখান থেকে এখনও কাঁচা রক্ত গড়াচ্ছে।

চৌকিদার খানিকক্ষণ পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকল। হাতির স্থির চোখ দুটির দিকে স্থির ভাবে চোখ রেখে কয়েক পা সে টিপেটিপে হেঁটে হঠাৎ বেদম ছুট দিল গ্রামের দিকে।

ঢোল-ক্যানেস্তারা বাজাও, চেলাকাঠ জ্বালাও, মশাল বানাও। জখমি হাতি যমের দূতী। বন্দুক দাগো, বন্দুক দাগো।

একটু আগে সাহেবরা চলে গেছে জঙ্গলের দিকে। আর একটা বন্দুক আছে গাঁয়ে, শাখারু রায়ের। যারা পালাবার তারা জানে না কোন দিকে পালাবে, যারা তাড়াবার তারা জানে না কোন দিকে তাড়াবে। দু-দলের প্রচণ্ড চিৎকার হট্টগোলে হাতিটা পালাল বটে, কিন্তু যাওয়ার আগে কয়েকটা ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়ে গেল।

আর একদিন গ্রামের কিছু লোক কাঠ কুড়োতে গেছে জঙ্গলে। নদী পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকেই দেখে, সামনে কালামানিক। অনেকদিন কালামানিক গাঁয়ে আসেনি বলে আজই গাঁয়ের বৌয়েরা বলেছিল, জঙ্গলে গেলে একবার খোঁজ করতে। জঙ্গলের জানোয়ার কবে তাদের কুটুম হয়ে গেছে। তাই কালামানিককে দেখে গাঁয়ের লোকরা আনন্দে ছুটে গেল। অমনই সে মাথা নিচু করে শিং বাগিয়ে তেড়ে এল। তাজ্জব ব্যাপার ! কালামানিক মানুষ দেখে তেড়ে আসার মানিকই নয়।

তবে কি কালামানিক নয় ? অন্য কোনও গণ্ডার ? ছুটতে ছুটতে গাঁয়ের মানুষরা পেছন ফিরে দেখল বারবার। না, চিনতে ভুল হয়নি। সেই কালামানিকই বটে, কিন্তু ছুটছে যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। পেছনের ডান পায়েতেই খোঁড়াচ্ছে। খানিকটা ছুটে নিজে থেকেই দাঁড়িয়ে পড়ল। খোঁড়া পায়ে কত

আর ছুটবে !

সেদিনে হাতির উৎপাতটা গাঁয়ের মানুষ জখমি হাতির ছন্নছাড়া ব্যবহার বলে বিশেষ পাত্তা দেয়নি। কিন্তু কালামানিক গাঁয়ের মানুষদের তাড়া করেছে এটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। ভীষণ ভাবনার কথা। হঠাৎ জানোয়ারগুলো এরকম উলটোপালটা ব্যবহার শুরু করল কেন ?

এ নিশ্চয়ই ওই শিকারি সাহেব দুজনের বেপরোয়া গুলি চালিয়ে জানোয়ার জখম করার ফল। ওদের ধান্দা একটাই। চামড়া চাই, শিং চাই, দাঁত চাই। মারো জানোয়ার, চালাও গুলি। কিছু পালাবে, কিছু ঘায়েল হবে, কিছু মরবে। তোলপাড় করো জঙ্গল।

জঙ্গলের জীবনে অশান্তি নদী পেরিয়ে বানগুড়ি গ্রামে চলে এলেও ওই সাহেব দুজনের কিছু এসে যায় না। এই আকাশের নীচে হাহাকার নেমে এলে বয়ে গেল। ওদের চাই সিরেফ ওদের ফয়দা।

তবু চেষ্টা তো করতেই হবে। এক করা হল গাঁয়ের বুড়োদের মাথা। সবাই গিয়ে বুঝিয়ে বলল, "দয়া মাঙছি, চলা যান তুমরা। জঙ্গলত জানোয়ার জঙ্গলায় থাক, গাঁওত মানুষা গাঁওয়ায় থাক, শহরত মানুষা নিজত মুলুকায় ফিরতা যান। তামাম জানোয়ার, তামাম মানুষা জিন্দা থাক। তুমরা চলা যান।"

"চলে যাব ? হা-হা-হা। এই জঙ্গল সাফ করে যাব, তার আগে না। তোরা যদি আগে আগে আমাদের ফেরত পাঠাতে চাস তোদেরই পাঠিয়ে দেব ওই ওপরে," বলে বড়সাহেব আঙুল তুলে আকাশটা দেখাল।

এখন একমাত্র ভরসা ওপরওয়ালা। কখন তার ঘুম ভাঙবে, কখন টনক নড়বে কে জানে ! বুড়োরা বুদ্ধি দিল, ওপরওয়ালার ঘুম ভাঙানোর জন্যে কীর্তনের যোগাড় করো। মশলাটা সবারই পছন্দ হল। যতদিন না ওপরওয়ালার ঘুম ভাঙে রোজ সন্ধ্যায় কীর্তন হবে।

সুরজ সিংয়ের বাড়িতে বসানো হল কীর্তনের আসর।

কয়েক দিন কোথাও কোনও নতুন ঘটনার খবর নেই। এ তো কীর্তনেরই মহিমা। উৎসাহ বাড়ছে গ্রামবাসীদের। আসরে জমায়েতও বাড়ছে।

তেমনই জবর জ্যোৎস্না ফুটছে দিনকে-দিন। জ্যোৎস্না তো নয়, আকাশ থেকে যেন লক্ষ লক্ষ বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ছে গ্রাম মাঠ জঙ্গল পাহাড়ের ওপর। দূরের বিরাট পাহাড়ের মাথায় তুষার-পাহাড় ঝকঝক করছে লক্ষ লক্ষ বাঘের অট্টহাসির মতো। এমন দারুণ জ্যোৎস্না কে কবে দেখেছে এই নিয়ে কথা বলতে বলতে আসর ভাঙার পরে দেবেন সিং আর ও-পাড়ার চার জন ঘরে ফিরছে।

বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ পথের ধারে কুয়োর আড়াল থেকে একটা দমকা জ্যোৎস্না ঘূর্ণি-ঝড়ের মতো আছড়ে পড়ল ওদের গায়ে, নিমেষে একজনকে তুলে নিয়ে এক ঝাঁক জোনাকির মতো ভাঁটি-ঝোপ টপকে চলে গেল।

সবাই হতভম্ব। একটু পরে সম্বিত পেয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি। কাকে নিয়ে গেল ?

শাখারু রায় বন্দুক নিয়ে এল, কেউ আনল বল্লম, কেউ কুড়ুল, কেউ কাটারি। আগুনের মশাল আর ব্যাটারির টর্চ জ্বেলে ভাঁটি-ঝোপের চারপাশটা দেখা হল। না বাঘ, না মানুষ। রক্তের চিহ্ন সংকেত করছে গাঁয়ের বাইরে।

রাজা এখনই যাবে দেবেনখুড়োর খোঁজে, এখনই গেলে এখনও বাঁচানো যেতে পারে।

পাগল নাকি ? এই অন্ধকারে যাবে বাঘের মুখ থেকে শিকার ছিনিয়ে আনতে ?

বড়দের কথায় মুখ বুজে থাকতে পারল না রাজা, মুখে মুখে জবাব দিল, "এই জোছনাকে কয়ান অন্ধকার ? আর বাঘ ? মামার বন্দুক আছে না ? ডরান কাঁয়ে ?"

এতক্ষণে সবার খেয়াল হয়, এই বিপদের মুখে শাখারু রায়ের বিধবা বোনের বেটা রাজা কখন এসে জুটেছে। এতটুকু ছোঁড়া, না আছে চেতন, না আছে বুদ্ধি, শুধু ছোকরা বয়সের লাফান-ঝাঁপান।

দেবেনের আশা ছেড়ে সবাই ঘরে ফিরে চলল। রাজার কব্জি মুঠোয় চেপে ধরে তার মামা শাখারু রায় তাকে ঘরে নিয়ে চলল, চলতে চলতে বকুনি, "তু যে বেওয়া মা'র একটা মাত্তর আশা, তু আনসান চললায় কী হবা মা'টার দশা ?"

নাঃ, রাজা আর মামা-খুড়োদের কিছু বোঝাতে পারবে না। আসল ব্যাপারটা ওরা বুঝতেই পারছে না। কিংবা বুঝেও চুপ করে আছে।

জঙ্গলে গিয়ে ওই লোকদুটো উৎপাত করছে, তাই জঙ্গলের জানোয়ার পালটা উৎপাত করছে গাঁয়ে এসে। পরদিন সকালে সবাই দেখেছে কুয়োর পাড়ে বাঘটার পায়ের ছাপ। চারটে থাবার একটা থাবা ভাল করে পাততে পারছে না নরম কাদাতেও। কালামানিকের মতো বাঘটারও পায়ে জখম। ওই খুনে দুটোরই কাজ।

জঙ্গলে জঙ্গলে ওদের ওই পশুপাখি মারা বন্ধ করতে হবে। কিন্তু বন্ধ করতে বললেই কি ওরা বন্ধ করবে ? ওরা কি গাঁয়ের বুড়োদের কথা শুনবে ? ওরা শুনবে বন্দুকের কথা। যার হাতে বাঁশি, সে খোঁজে বাঁশি বাজাবার সুযোগ, বন্দুকওয়ালা খোঁজে বন্দুক চালাবার ছুতো।

দেবেনখুড়োকে বাঘে নিয়ে গেছে। তার জন্যে মামা-খুড়ো এখন থানা-পুলিশ করছে। চিঠি লিখবে জেলাশাসকের কাছে। তার সঙ্গে শিকারি সাহেবদের কথা জানানো হবে কি হবে না তা নিয়ে গাঁয়ের মাতব্বরদের মধ্যে মশলাবাজি চলছে।

মামা-খুড়োরা ওই খুনেদুটোকে নিয়ে যা খুশি করুক। রাজা তার মতো একটা ব্যবস্থা করবে। শুধু গোপালখুড়োকে দলে চাই। মতলবটা খুব গোপন রাখতে হবে। গোপালখুড়ো আর গাঁয়ের কয়েকজন সাহসী ছেলেমেয়েকে নিয়ে রাজা গোপনে একটা সভা ডেকে ফেলল। মাটিতে একটা পাতাসুদ্ধু অর্জুন গাছের ডাল পুঁতে সেটাকে ঘিরে বসল সবাই। ডালটা ধরে সবাই প্রতিজ্ঞা করল, জান দিয়ে রাখবে আজকের মশলার মান।

দুদিন পরে থানা থেকে পুলিশ এল শিকারি সাহেবদের কাছে। বদ্ধ ঘরে বহুক্ষণ কথাবার্তা বলে পুলিশরা চলে গেল। তারপর সাহেবরা ডেকে পাঠাল গাঁয়ের বুড়োদের। সামনে দাঁড় করিয়ে ভীষণ বকল, "কোনওদিন আক্কেল হবে না তোদের ? থানায় খবর দিলেই হল ? কে বলেছে বাঘে নিয়েছে ? কে লাশ দেখেছে ? কী প্রমাণ যে চারজনে মিলে দেবেন সিংকে খুন করেনি ?"

"খুন ?" চমকে উঠল মাতব্বররাও।

কেঁদে ফেলল দেবেনের শেষ চার সাথি। "না, না, আমরা খুন করিনি।"

"থাক, থাক, আর কাঁদতে হবে না। আমরা সব ঠিক করে দিয়েছি। কিন্তু বলে দিচ্ছি, বোকার মতো আর চালাকি করিস না, তোদেরই বিপদ হবে। বারবার বাঁচাতে পারব না।"

শিকারি সাহেবরা পরপর দু'রাত্তির গ্রাম ছেড়ে বেরোতে পারেনি। কে জানে কখন পুলিশ এসে পড়বে। থানায় খবর গেছে।

আজ পুলিশ তদন্ত করে গেল। এবার তারা নিশ্চিন্তে বেরোতে পারবে। গোপালকে ডেকে বলল, "শোন, আজ জঙ্গলে যাব। সেই মতো রান্নার ব্যবস্থা কর।" তারপর আঁকা নকশাটা বের করে দেখাল, "বলেছিলি না ঝরনার এখানটাতে হরিণরা আসে ঘাস খেতে, আর এখানে লম্বা-লম্বা ঘাসে বাঘ লুকিয়ে থাকে হরিণ ধরবার জন্যে ?"

গোপাল মাথা হেলিয়ে জানাল, সব ঠিক।

সন্ধের মুখে শিকারি দু'জন বেরিয়ে পড়ল। আকাশে তখনও দিনের আলো, কিন্তু জঙ্গলের ভেতরে মাটি ফুঁড়ে গাছ-লতা-পাতা বেয়ে অন্ধকার ওপরে উঠতে শুরু করেছে। খুব সাবধানে চলেছে দু'জনে। জঙ্গল জুড়ে ঝিঁঝির ডাকের তালেতালে চারপাশে জোনাকির ঝাঁক জ্বলছে নিবছে। শেয়ালের পাল ডেকে সময়টা জানিয়ে দিল। ব্যাঙ কাঁদছে সাপের মুখে ধরা পড়ে। পায়ের নীচে মচমচ করছে শুকনো পাতার রাশ। প্যাঁচা ডেকে উড়ে গেল অন্য গাছে। নীচে কাছাকাছি এসে গেছে।

এই সেই জায়গাটা। জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ অনেকখানি ফাঁকা জুড়ে জ্যোৎস্না জমে আছে বিশাল দিঘির মতো, ঢেউ নেই, কিন্তু গভীর। একটু পরেই হরিণের দল আসবে এখানে চরতে। আর ওদিকের লম্বা ঘাসে বাঘ ওত পেতে থাকবে জ্যোৎস্নার দিঘিতে ভেসে পড়ার অপেক্ষায়। বন্দুক হাতে মানুষ থাকবে উঁচু গাছের ডালে মৃত্যুর ব্যবসা করবে বলে।

কাছেই একটা ঘোরকালো ডালপালা ছড়ানো উঁচু গাছ দেখে তারা পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল সেদিকে। গাছটার নীচে প্রায় পৌঁছে গেছে। আচমকা কী যেন হয়ে গেল। তারা ছিটকে উঠে গেল উঁচু ডালের কাছাকাছি, বন্দুকদুটো ফসকে পড়ে গেল নীচে, দুজনে ঝুলতে লাগল শূন্য অন্ধকারে। জঙ্গলের কঠিন লতাপাতা হঠাৎ যেন জ্যান্ত হয়ে তাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে।

ক্রমশ তাদের ভয় করতে লাগল। বোধহয় অন্য কোনও শিকারির পাতা ফাঁদে তারা ধরা পড়েছে। এখন উপায় ? যত রাত বাড়ে তত ভয় বাড়ে। বাঘ কি হাতি এসে পড়লে কী হবে ? ভাবতে না ভাবতেই নীচের গাঢ় অন্ধকারে দপ করে দুটো কয়লা জ্বলে উঠল। দরদর করে ঘামতে লাগল দুজনে।

"ফাঁদটা আর একটু ওপরে টেনে তোল," একজন বলল আর একজনকে। কারও গলা দিয়ে আওয়াজ বের হল না, কেউ কারও কথা শুনতে পেল না।

মাটি থেকে আগুনের ভাঁটাদুটো লাফ দিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করল, কিন্তু ফাঁদে ঝোলা মানুষ দুটোর নাগাল পেল না। কয়েকবার চেষ্টা করে রেগে গিয়ে আগুনের ভাঁটাদুটো জঙ্গল কাঁপিয়ে গর্জন করল। তারপর গরগর করতে করতে ছেঁড়া-ছেঁড়া জ্যোৎস্নায় পায়চারি করল কয়েকবার। আবার লাফাল। আবার পায়চারি। আবার লাফালাফি। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল মাটিতে। মধ্যে মধ্যে গর্জন ছাড়ে, মধ্যে মধ্যে নিজের গা চাটে, মধ্যে মধ্যে গরগর করে।

নীচের বাঘ জানতেও পারল না কখন শিকারিসাহেব দুজন জঙ্গলের ঠাণ্ডা বাতাসে দুলতে দুলতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, এক রাতের জ্যোৎস্না মেশানো অন্ধকারে কী ভাবে তাদের মাথা ভরা কালো চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে।

পরদিন সকালে যখন তাদের জ্ঞান ফিরল তখন নীল আকাশের নীচে তারা চিত হয়ে শুয়ে, তাদের হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা, তাদের ঘিরে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা, কারও হাতে শাবল, কারও হাতে তীরধনুক, কারও হাতে মাছ মারার ট্যাঁটা, শুধু গোপাল আর রাজার হাতে শিকারিদের বন্দুকদুটো। শিকারিদের কোমরে দড়ি বেঁধে গোপাল আর রাজার দল টানতে টানতে নিয়ে চলল জঙ্গলের পথে। নদী পার হবার আগে গাছের গুঁড়িতে মেরে মেরে চুরমার করে ফেলল বন্দুক দুটো।

গ্রামে এনে শিকারিসাহেবদের দাঁড় করানো হলো সেই তেঁতুল গাছটার নীচে। গ্রাম উজাড় করে সবাই এসে জড় হল সেখানে। তখন পিছমোড়া হাতের বাঁধন খুলে দিলে শিকারিদুজন হাত জোড় করে বলল, "দয়া করে ছেড়ে দাও, আমরা চলে যাই। আমাদের ক্ষমা করো, জঙ্গলের পশুপাখি আর কখনও মারব না, মারব না, মারব না।"

ছবি : প্রণবেশ মাইতি

অঙ্কের ধাঁধা

শিশিরকুমার নিয়োগী

১। আটটি ৮-এর সাহায্যে ১০০০ লেখো।

২। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাত্র কয়েক বছর আগের ঘটনা। নাতি বলল, "দাদু আমার থেকে ৬৫ বছরের বড় ছিলেন। এই বছর উনি মারা গেছেন। মারা যাবার সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল তিনি যে-বছর জন্মান সেই বছরের বর্গমূল ও যে-বছর মারা যান, সেই বছরের বর্গমূলের যোগফলের সমান।

নাতির বয়স কত ?

৩। কয়েকটি ছেলে এক দোকানে গিয়ে সবাই একই দামের জিনিস কিনল। প্রত্যেকটি জিনিসের দাম ১০ পয়সার বেশি। তারা মোট ২ টাকা ৩ পয়সার জিনিস কিনল। কটা ছেলে ছিল ?

উত্তর

১। ৮+৮+৮+৮৮+৮৮৮=১০০০

২। নাতির বয়স ২২ বছর। দাদুর জন্ম-বছর—১৮৪৯, যার বর্গমূল ৪৩। দাদুর মৃত্যুর বছর ১৯৩৬, যার বর্গমূল ৪৪। মৃত্যুর সময়ে দাদুর বয়স ৪৩+৪৪=৮৭। নাতির বয়স ৮৭-৬৫=২২ বছর।

৩। ৭টা ছেলে ছিল এবং প্রত্যেকে ২৯ পয়সা দামের জিনিস কিনেছে। আর-কোনও উত্তর হবে না।

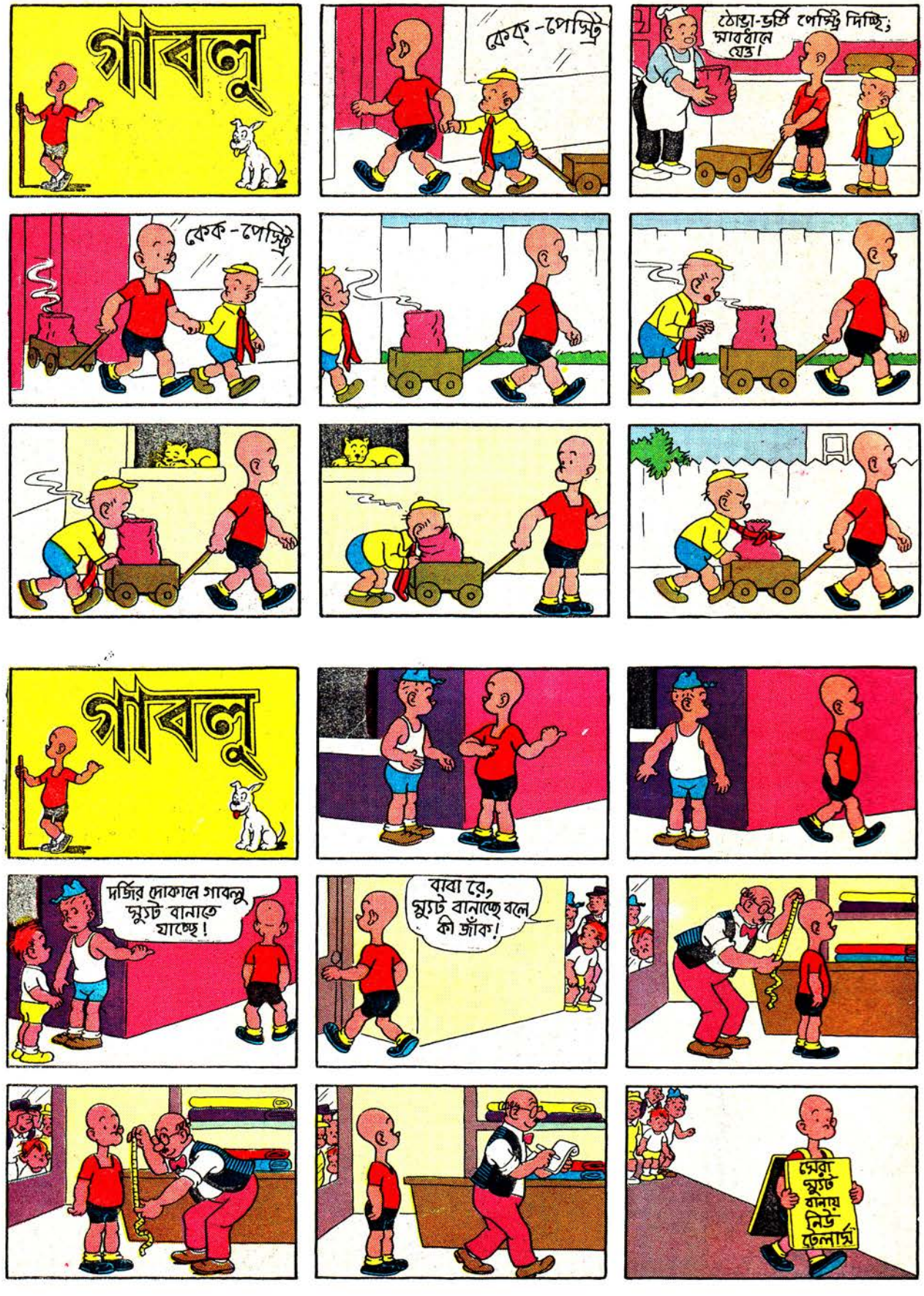

গাবলু
কেক্‌-পেস্ট্রি
ঠোঙা-ভর্তি পেস্ট্রি দিচ্ছি; সাবধানে যেও!
কেক-পেস্ট্রি

গাবলু
দর্জির দোকানে গাবলু স্যুট বানাতে যাচ্ছে!
বাবা রে, স্যুট বানাচ্ছে বলে কী জাঁক!
সেরা স্যুট বানায় নিউ টেলার্স

ইয়ান বথাম (বেপরোয়া ৬০ রান, এবং ৪ উইকেট) ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

হেডিংলেতে হারল অস্ট্রেলিয়া

অশোক রায়

ওয়ান-ডে সিরিজের তিন ম্যাচের মধ্যে প্রথম দুটিতেই অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার মানে ইংল্যাণ্ড। শেষেরটি জেতার পরেও কিন্তু ইংরেজ-সমর্থকরা ভাবেনি, অ্যালান বর্ডারের অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ম্যাচে ইংল্যাণ্ড উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারবে।

হেডিংলেতে প্রথম টেস্টে বর্ডার টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে অবশ্য ইংলিশ বোলাররা তাতে কিছুটা খুশিই হয়েছিলেন। কিন্তু পেস-স্পিনের ঝাপটা সামলে অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম দিনের শেষে ২৮৪—৬ পৌঁছে দিল অস্ট্রেলিয়ার সহ-অধিনায়ক অ্যাণ্ড্রু হিলডিচের সেঞ্চুরি। দ্বিতীয় দিন একটা সময়ে বোর্ডে ৬ উইকেটে ৩২৬ রান দেখে মনে হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া বোধহয় বিরাট একটা ইনিংস গড়ার কাজ শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের ইয়ান বথামের ভাবনাটা ছিল অন্যরকম। গত বছর বথাম ভারত সফরে আসেননি ইচ্ছে করেই। বথামকে বাদ দিয়েই ইংল্যাণ্ড সিরিজ জিতেছিল ভারতের বিরুদ্ধে। এবার ইংল্যাণ্ড দলে স্থান পাবার আগে বথাম কিছু অপ্রিয় সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। ভেতরে ভেতরে বথাম তৈরি হচ্ছিলেন এই সমালোচনার বিরুদ্ধে একটা দারুণ কিছু করে দেখাতে। একটা স্পেলে মাত্র চার বলে তিন উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ইনিংসকে বথাম নামিয়ে আনলেন ৩৩১ রানে।

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে গোড়াপত্তনে এলেন গ্রাহাম গুচ। তিন বছর সাসপেণ্ড থাকার পরে খেলতে নেমে ওয়ান-ডে

সিরিজে দুর্দান্ত ব্যাট করেছেন গুচ। টেস্টে গুচের ব্যাট কীভাবে রানের মধ্যে ফেরে তা দেখার অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে ছিল ইংরেজরা। কিন্তু নিরাশ করলেন গুচ। তবে ইংল্যাণ্ডকে বিশাল রানে (৫৩৩) পৌঁছে দিলেন টিম রবিনসন (১৭৫)। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে রবিনসনের এটাই প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি। ইংল্যাণ্ডের ইনিংসে আরও একজনকে মনে রাখতে হবে। তিনি ইয়ান বথাম। বল ছেড়ে ব্যাট হাতে ক্রিজে এসেই বথাম নির্দয়ভাবে থ্যাঁতলাতে শুরু করেন অস্ট্রেলীয় বোলারদের। দশটা 'চার' এবং দুটি 'ছক্কা' সহ বথাম ঝড়ের গতিতে করেন ৬০ রান। এইরকম একটা ইনিংস যে-কোনও বিপক্ষ বোলিং পঙ্গু করে দিতে পারে।

চতুর্থ দিনে ২০২ রানে পিছিয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়াকে ইনিংসের শুরুতেই নাড়া দেন বথাম। ইনিংসের নবম বলেই বথামের বলে ব্যাকোয়ার্ড শর্ট লেগে ক্যাচ তুলে ফিরে যান ওপেনার গ্রেম উড। চা-বিরতিতে অস্ট্রেলিয়া দু' উইকেটে ১৫১ রান তোলায় এবং প্রথম ইনিংসের সেঞ্চুরিকারী অ্যাণ্ড্রু হিলডিচ ৮০ রানে অপরাজিত থাকায় মনে হচ্ছিল হয়তো এ-যাত্রায় অস্ট্রেলিয়া বেঁচে গেল। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান ইনিংসকে ৩২৪ রানের গণ্ডির মধ্যে আটকে দেন বথাম (৪ উইকেট) এবং এমবুরি (৫ উইকেট)।

তিন ঘণ্টার কিছু বেশি সময়ে ১২৩ রান করার সহজতম সুযোগ সামনে রেখে ইংল্যাণ্ড জয়ের জন্যে নেমে পড়ে। পরাজয় নিশ্চিত জেনেও অস্ট্রেলিয়া কিন্তু সাধ্যমতো লড়াই বাধাবার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে ওঠে। তবে অস্ট্রেলিয়ান বোলারদের যাবতীয় আক্রমণ সামলে ইংল্যাণ্ড শেষ পর্যন্ত জয় কুড়িয়ে নেয় পাঁচ উইকেট খুইয়ে। 'ম্যান অব দি ম্যাচ' নির্বাচিত হন ইংল্যাণ্ডের টিম রবিনসন। খেলার শেষের দিকে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। অ্যালান ল্যাম একটা উঁচু শট নিলে লং-লেগে দাঁড়ানো লসন তা ধরার জন্যে ছুটতে থাকেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই মাঠে নেমে-পড়া শয়ে শয়ে দর্শক ঘিরে ধরে লসনকে। ফলে লসন ক্যাচটি ধরতেই পারেননি। সেই সুযোগে জয়ের রানটি সংগ্রহ করে নেন ল্যাম।

ছয় টেস্টের সিরিজে ইংল্যাণ্ড আপাতত এগিয়ে গেল ১—০ মার্জিনে।

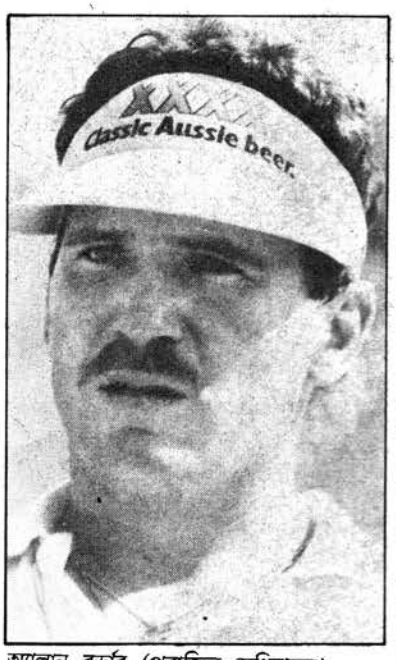

অ্যালান বর্ডার (পরাজিত অধিনায়ক)

জন এমবুরি (৫ উইকেট)

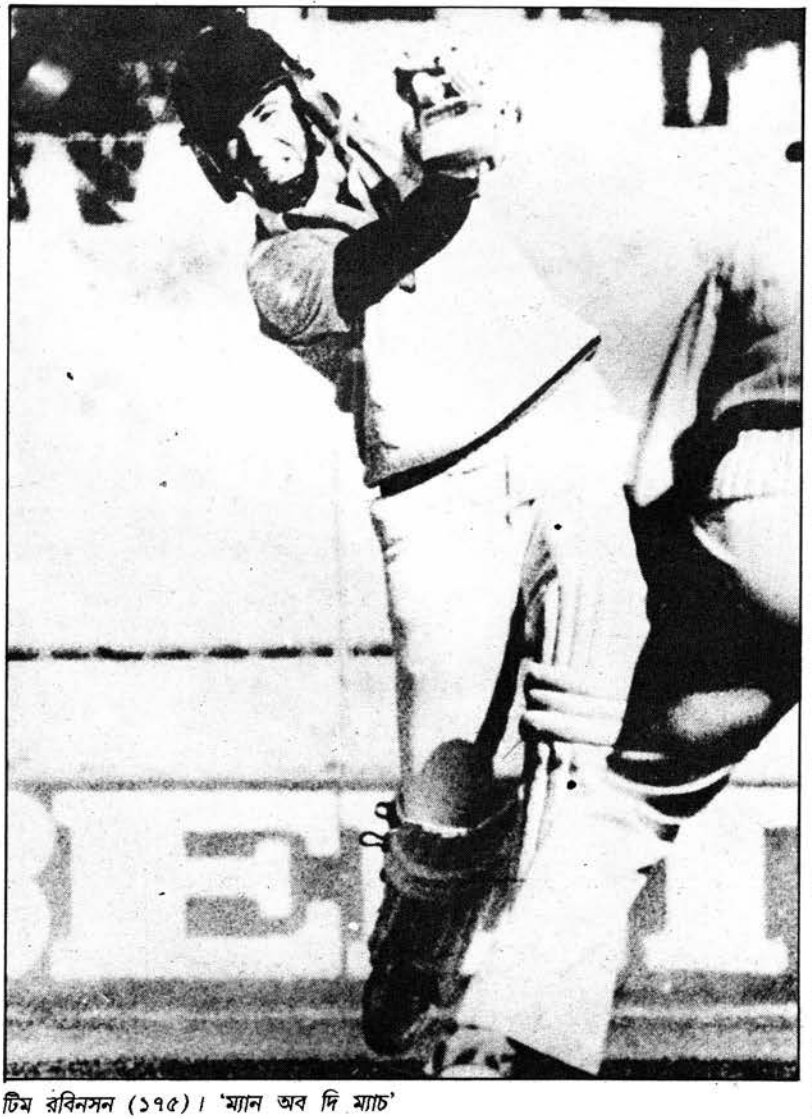
টিম রবিনসন (১৭৫)। 'ম্যান অব দি ম্যাচ'

উইকেটকিপারের বরাত

সুজয় সোম

মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাবের সঙ্গে উনিশশো ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ সালের সিরিজে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার খেলা। অস্ট্রেলিয়া দলে খেলছেন ডন ব্রাডম্যান। ক্যাচ লুফে বা স্টাম্পড করে পৃথিবীর সেরা ব্যাটস্‌ম্যানকে আউট করার বড় সাধ এম· সি· সি· দলের ছাব্বিশ বছর বয়সের ছোকরা উইকেটকিপারের।

হাপিত্যেশ অপেক্ষার পর প্যাভিলিয়ন থেকে বেরিয়ে, ধীরেসুস্থে হেঁটে, ব্রাড্‌ম্যান এসে পৌঁছলেন উইকেটে। এক নজরেই ঠাওর করা গেল, ডনের অসুস্থতা এখনও কাটেনি। কয়েক বছর ধরেই ছোট-বড় নানা অসুখে ভুগছেন তিনি। নিজের পারফরমেন্স দেখাতে পারছেন না। আত্মবিশ্বাসেও যেন চিড় ধরেছে। ক্রিকেটপ্রেমী মানুষমাত্রই দুঃখিত, হতাশ। ছোকরা উইকেটকিপার কাষ্ঠ হাসলেন, এই সুবর্ণ সুযোগ।

বল করতে হুড়মুড় করে ছুটে আসছেন ডিক পোলার্ড। ডন স্টান্স নিয়ে দাঁড়ালেন। ব্যাটের পেছন দিকটা পয়েন্টের দিকে ফেরানো। ক্রিকেটের গ্রামারে ভঙ্গিটা নিখুঁত নয়। যদিও ব্যাটস্‌ম্যানের চোখে-মুখে দৃঢ়তা। শক্ত করে চোয়াল চেপে ধরেছেন। মনে হল, কনসেনট্রেশনও দারুণ।

ডনের রোজগার তখন মোটে ২ রান, পোলার্ডের একটা ঝোলানো বল তাঁকে ফাঁকি দিল। ঠিকমতো ডিফেন্স নিতে পারলেন না। ব্যাটে-বলে সামান্য ছোঁয়া লাগল। বলটা লুফবার চেষ্টা করলেন না উইকেটকিপার। দরকার কী, বলটাই তো উইকেট ভেঙে দেবে নির্ঘাত।

সেরকম ঘটল না। বলটা স্টাম্পের পাশ ঘেঁষে চলে এল। শেষ চেষ্টা করতে পড়ি-মরি ঝাঁপিয়ে পড়লেন উইকেটকিপার। বড্ড দেরি হয়ে গেছে। রাগে-দুঃখে মাথার চুল খিমচে ধরলেন।

ফের সুযোগ এল ৫৪ রানে। বেকায়দায় পড়ে ডন একটা ভালরকম খোঁচা লাগালেন। বলটাকে মুঠোর ভেতর পুরে ফেলা মোটেও কঠিন ছিল না। কোথা থেকে কী হয়ে গেল, ফশকানো বল আছড়ে পড়ল ঘাসের ওপর।

ডন ব্রাডম্যান প্যাভিলিয়নে ফিরলেন ৭৬ রান করে। ইনিংসের শুরুতে তাঁর চুপসে থাকা চেহারাটা আত্মবিশ্বাসে তখন ডগমগ করছে।

একথা ঠিক, যদি ২ রানে বিদায় নিতেন ডন, তখন তাঁর শরীর ও মনের যা অবস্থা, হয়তো ক্রিকেটেই আর ফিরতেন না। আরও ক'টা দিন তাঁর ক্রিকেট মাঠে থেকে যাবার মূলে ওই ছোকরা উইকেটকিপার। শুধু ফিরে আসাই নয়, কী দাপট! ওই সিরিজে ডনের টেস্ট-রানের অ্যাভারেজ : ৯৭-১!

কাজে গাফিলতির সাজা পেলেন

ডন ব্রাডম্যান

গডফ্রে ইভান্‌স

উইকেটরক্ষক। দল থেকে বেমালুম খারিজ। ক'দিন বাদে আবার চান্স পেলেন সিডনি টেস্টে। এবং সকলে অবাক চোখে দেখল তাঁর রোমাঞ্চকর উইকেটকিপিং। ওই টেস্টে দু-দফায় অস্ট্রেলিয়ার রান ১০৫৪। ক্যাচ ফশকানো দূরে থাক্, একটা বাই-রানও হল না। ব্রাডম্যান সিডনির মাঠে ২৩৪ রান করলেন, সিরিজের বাকি খেলায় আরও অনেক রান, কিন্তু তাঁকে আউট করার তৃতীয় কোনও সুযোগ পেলেন না সেই হতভাগ্য উইকেটকিপার।

পরের বছর, উনিশশো আটচল্লিশ সালে ডনের শেষ ইংল্যাণ্ড ট্যুর। এবারেও আশায় আশায় দিন গুনতে লাগলেন সেই যুবক। তাঁর সেই ছেলেবেলা থেকে দেখা স্বপ্ন অন্তত একবার সত্যি হবে না? ক্রিকেট-জীবনের সেরা পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবেন? শেষ সুযোগ পেলেন কেন্ট দলের খেলোয়াড় হিসেবে। ডনের পেছনে চিতা বাঘের মতো ওত পেতে রইলেন।

তখন বল করছেন মিডিয়াম পেস বোলার এডি ক্র্যাশ, ডনের রান সবে ৫০ পেরিয়েছে। হঠাৎ একটা বলকে তড়িঘড়ি পেটাতে গেলেন। বলটা বেদম জোরে ব্যাটের তলায় লেগে পেছন দিকে হুম্‌ড়ি খেল, একেবারে উইকেটকিপারের মুঠোয়। টগবগে আনন্দে লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন উইকেটরক্ষক, সামলে নিলেন। শব্দটা তো ব্যাটে বল লাগার নয়, মাটিতে ব্যাট ঠোকার। ইশ্, সুযোগটা এসেও এল না। আউটের অ্যাপিল না করে, ব্যাজার মুখে বল ফেরত পাঠালেন বোলারকে।

খেলার শেষে প্যাভিলিয়নে দেখা হতেই মুচকি হেসে ব্রাডম্যান বললেন, "কী বোকামিটাই না করলে, গডফ্রে! আমি জানি, কয়েক বছর ধরে তুমি আমাকে পেতে চাইছ। আজ হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলে?"

"তার মানে! ওই বলটা আপনার ব্যাটে লেগেছিল?"

"নিশ্চয়ই। রীতিমত জোরে। সুযোগ তুমি পেয়েছিলে, ভায়া···কিন্তু তোমার বরাতে নেই!"

কোনও মতে নিজেকে সামলিয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন গডফ্রে ইভান্‌স। "আউফ্···!"

অ্যাশেজ-যুদ্ধের নায়করা

নৃপতি চৌধুরী

টেস্ট ক্রিকেটে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার লড়াই মানেই 'অ্যাশেজ' যুদ্ধ। এত বড় সম্মানের লড়াই টেস্ট ক্রিকেটে আর কোনও দেশের মধ্যে নেই। দেখতে-দেখতে অ্যাশেজ-যুদ্ধের বয়সও একশো পার হল। তোমরা সবাই জানো, অ্যালান বর্ডারের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া এবং ডেভিড গাওয়ারের নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ড এখন মেতে রয়েছে অ্যাশেজ দখলের লড়াইতে। গত একশো দুই বছরের সংগ্রামের কথা ভেবেই অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত একটি ক্রিকেট-পত্রিকা তার পাঠকদের কাছে ইঙ্গ-অস্ট্রেলিয়ার 'অ্যাশেজ গ্রেট'দের নিয়ে দুটি সেরা দল তৈরি করে দেবার আবেদন জানিয়েছিল। চূড়ান্ত দল বেছে দেবার দায়িত্বে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার রিচি বেনো, টম গুডম্যান এবং ইংল্যাণ্ডের ট্রেভর বেইলি, জন আরলট ও জিম সোয়ানটন। সেই বিখ্যাত ও মহান ক্রিকেটারদের সঙ্গে এসো একটু পরিচিত হওয়া যাক।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ওপেন করবেন ভিক্টর ট্রাম্পার এবং বিল পন্সফোর্ড। ট্রাম্পারের কথা তোমরা শুনেছ কি? ট্রাম্পার হলেন এক বিস্ময়কর ক্রিকেট-শিল্পী। বলা হয়, ব্রাডম্যানের আকর্ষণও কমে যেত যদি সেই আসরে উপস্থিত থাকতেন ভিক্টর ট্রাম্পার। রানের বিরাট পাহাড় গড়তে ওয়ান-ডাউনে আসবেন ডন ব্রাডম্যান,

ডব্লু· জি· গ্রেস

শুধু ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেই যাঁর ব্যাটে রয়েছে পাঁচ হাজারের বেশি রান।

চার, পাঁচ, ছয় নম্বরে পরপর আসবেন গ্রেগ চ্যাপেল, চার্লস ম্যাকারটনি এবং বাঁ-হাতি নিল হার্ভে। বেশ কিছু রান আসবে এঁদের ব্যাটেও। উইকেটরক্ষক হিসেবে রডনি মার্শের জায়গায় নির্বাচিত হয়েছেন ডন ট্যালন। এর পরে থাকবেন তিন বিশ্ব-ত্রাস পেস

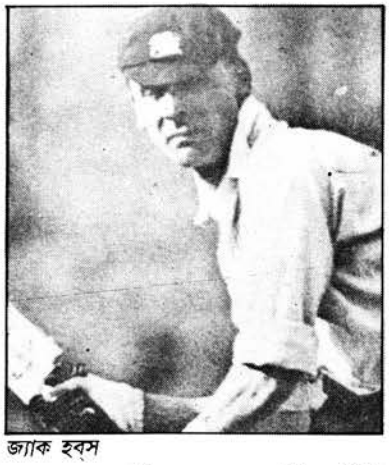

জ্যাক হবস

বোলার রে লিণ্ডওয়াল, ডেনিস লিলি এবং 'ডেমন' স্পোফোর্থ। বিশেষজ্ঞরা বলেন, ক্রিকেটের ইতিহাসে লিণ্ডওয়ালের চেয়ে দ্রুততম ফাস্টবোলার হয়নি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা লিণ্ডওয়ালের মতো চমৎকার বোলিং অ্যাকশন আর কারুরই নয়। তাঁর সঙ্গে থাকবেন লিলি, টেস্টে সর্বাধিক উইকেট দখলে রাখার কৃতিত্বটি এখনও যাঁর কব্জায়। আর স্পোফোর্থ রইলেন তিন নম্বর ফাস্টবোলার। বিল ওরিলির ওপর

ডন ব্রাডম্যান

স্পিনের দায়িত্ব চাপিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে অস্ট্রেলিয়া।

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ওপেন করবেন প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ১৯৭টি সেঞ্চুরিকারী জ্যাক্ হবস। সঙ্গে আসবেন ইংলিশ ক্রিকেটের জনক ডব্লু· জি· গ্রেস (লেন হাটন চান্স না পাওয়ায় অনেকেই অবাক হয়েছেন)। রাজকীয় কভার ড্রাইভ দেখতে হলে ওয়ান-ডাউনে ওয়ালি হ্যামণ্ডের দিকে তাকিয়ে থাকতেই হবে। চার নম্বরে ডেনিস কম্পটন থাকলেও পরের

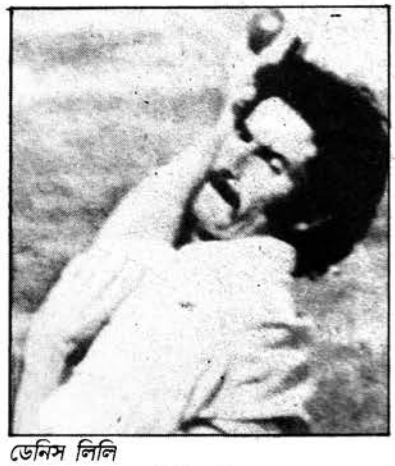

ডেনিস লিলি

তিনজন ফ্রাঙ্ক উলি, উইলফ্রেড রোডস এবং ইয়ান বথাম কিন্তু স্পেশালিস্ট ব্যাটসম্যান নন। তবে তিনজনই উঁচুমানের অলরাউণ্ডার। ক্যাচ ধরার ব্যাপারে উলির হাতদুটি দারুণ বিশ্বস্ত। এক থেকে এগারো নম্বরে ব্যাট করার এক আশ্চর্য বিশ্বরেকর্ড আছে রোডসের (ভারতের ভিনু মাঁকড়েরও এই রেকর্ড আছে)। উইকেটরক্ষক হিসেবে অ্যালান নটকে টপকে দলে স্থান পেয়েছেন গডফ্রে ইভান্স। যথার্থ পেস বোলার হিসেবে ইংল্যাণ্ড একমাত্র রেখেছে ফ্রেডি ট্রুম্যানকে। সঙ্গে থাকবেন সিডনি বার্নেস। মাত্র ৪ টেস্টে ৪৯ উইকেট নেবার বিশ্বরেকর্ড রয়েছে বার্নেসের দখলে। বডিলাইনের স্রষ্টা, বিখ্যাত ফাস্টবোলার হ্যারল্ড লারউড কেন সুযোগ পাননি বোঝা যাচ্ছে না। তবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একটি টেস্টে ১৯টি উইকেট পাবার বিশ্বরেকর্ডধারী অফ্ স্পিনার জিম লেকার ইংল্যাণ্ডকে অবশ্য অনেকটা ভরসা দেবেন।

এই টিম নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে সত্যিই যদি খেলা হয়, কী হবে বলো তো?

বিশ্ব-ব্যাডমিন্টনে হ্যান্ জিয়ান্ চ্যাম্পিয়ন

সম্রাট রায়

ব্যাডমিন্টনের কথা উঠলে এখনও আমরা প্রকাশ পাড়ুকোনের দিকেই তাকিয়ে থাকি। যদিও আমরা জানি, প্রকাশ নিশ্চিতভাবেই তাঁর সোনালি দিনগুলো পার হয়ে এসেছেন। কিন্তু করার আর কী বা আছে বলো! ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে প্রকাশের চেয়ে উজ্জ্বলতর কোনও নক্ষত্রের সন্ধান তো এখনও আমরা পাইনি।

বিশ্ব-ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে ২৯টি দেশের ১৯০ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে প্রকাশ শুরু করেছিলেন ভাল। কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত এগিয়েও ছিলেন সুন্দরভাবে। কিন্তু তারপরেই প্রকাশ প্রতিহত হলেন ডেনমার্কের মর্টেন ফ্রস্টের কাছে। ইদানীং প্রকাশ কোনও সময়েই ফ্রস্টের বিরুদ্ধে দারুণ কিছু করতে পারছেন না। কেউ-কেউ মনে করেন, ডেনমার্কে থাকাকালীন ফ্রস্টের সঙ্গে ক্রমাগত প্র্যাকটিস করায় প্রকাশের সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই হয়েছে বেশি। অন্তত ফ্রস্টের কাছে প্রকাশের যাবতীয় রহস্যময়তা ফাঁস হয়ে গেছে। তাই কোনও প্রতিযোগিতাতেই এখন আর প্রকাশ কিছুতেই ফ্রস্টকে কব্জায় আনতে পারছেন না। কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রস্টের বিরুদ্ধে প্রকাশের লড়াই থেমে গেল ৪-১৫, ৬-১৫ পয়েন্টে। প্রকাশের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-ব্যাডমিন্টনে ভারতীয় চ্যালেঞ্জও শেষ হয়ে গেল। কারণ চিনের হ্যান্ জিয়ানের কাছে হেরে দ্বিতীয় রাউণ্ডেই বিদায় নিয়েছিলেন কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়ন ভারতের সৈয়দ মোদি।

মর্টেন ফ্রস্ট (ফাইনালে পরাস্ত)

পুরুষদের সিঙ্গলস সেমি-ফাইনালে চিন এবং ডেনমার্ক পরস্পরের মুখোমুখি হয়। চিনের ইয়াং ইয়াংকে ১৫-৮, ১৫-৫ পয়েন্টে হারিয়ে একদিক থেকে ফাইনালে ওঠেন ডেনমার্কের মর্টেন ফ্রস্ট। অন্যদিকে ডেনমার্কের পিটার নিয়েরহফকে ১৫-৯, ১৭-১৪ পয়েন্টে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছন চিনের হ্যান্ জিয়ান।

ফাইনালের আগে পর্যন্ত ফ্রস্টই ছিলেন ফেভারিট। কিন্তু আসল ম্যাচে, আসল সময়ে দুর্দান্ত খেললেন হ্যান্ জিয়ান।

চিনের এই লড়িয়ে মেজাজের খেলোয়াড়টিকে দিল্লি এশিয়াডে দেখেছিলাম। প্রচণ্ড লড়াই করে যেভাবে ইন্দোনেশিয়ার লিয়েম সুই কিংকে হারিয়ে সোনা জিতেছিলেন তা ভোলার নয়।

ফাইনালে হ্যান্ জিয়ানের সাফল্য সম্পর্কে আমি কিন্তু প্রথম থেকেই নিশ্চিত ছিলাম। ম্যাচ জিতেছেন বলেই নয়, দিল্লিতে হ্যান্ জিয়ানের মরণপণ সংগ্রাম দেখেছি বলেই ওঁর সম্পর্কে আমার দারুণ শ্রদ্ধা জন্মেছিল।

ফাইনালে সব ধারণা ওলটপালট করে ফ্রস্টের বাধা চূর্ণ করলেন হ্যান্ জিয়ান মাত্র ৭৫ মিনিটে। জিতলেন ১৪-১৯, ১৫-১০, ১৫-৯ পয়েন্টে। এইখানে একটা কথা বলতেই হবে, অল-ইংল্যাণ্ড চ্যাম্পিয়ন চিনের ঝাও জিয়ান হুয়া বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপে জেতার স্বপ্ন নিয়ে এসেছিলেন খেলতে। কিন্তু নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় তিনি নাম প্রত্যাহার করে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন। ঝাও থাকলে লড়াই আরও জমত নিঃসন্দেহে।

মেয়েদের সেমি-ফাইনাল এবং ফাইনাল চিনের ঘরোয়া ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ফাইনালে হ্যান আই পিং ৬-১১, ১২-১১, ১১-২ পয়েন্টে পরাজিত করেন স্বদেশের উ জিয়ান কিউকে।

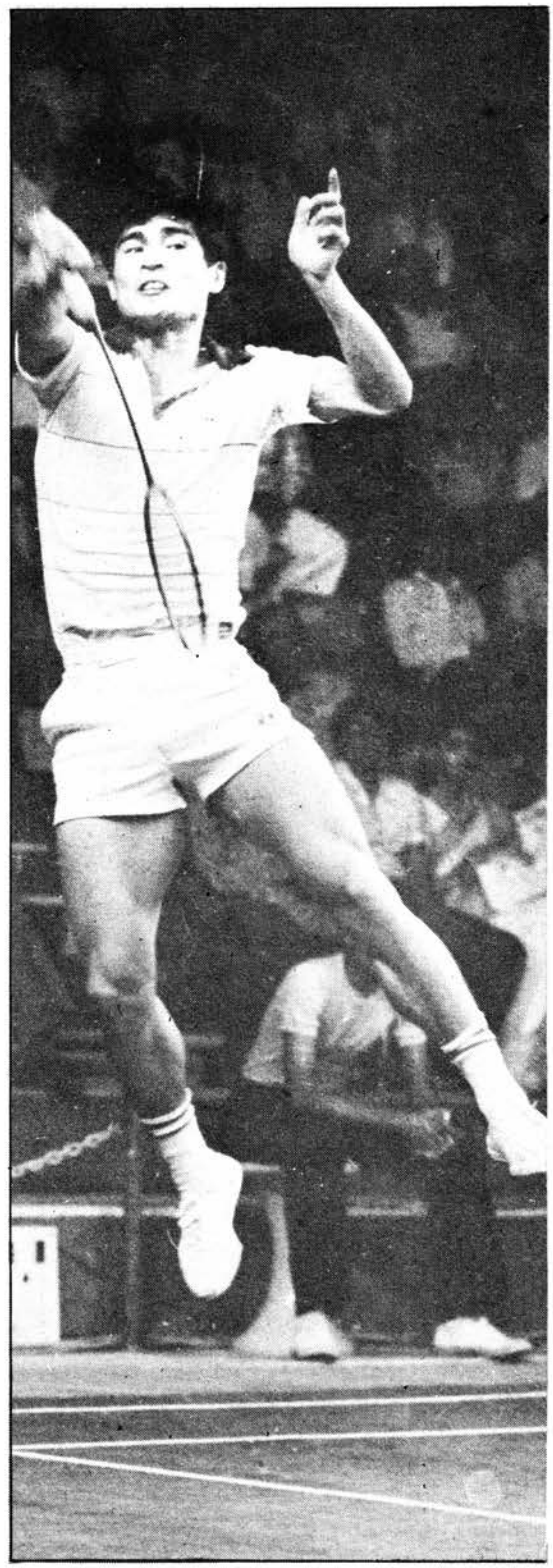

হ্যান জিয়ান (ফাইনালে জয়ী)

কলম্বো যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল

রাজা গুপ্ত

এ-বছর নবম ফেডারেশন কাপের খেলার ওপর বাড়তি গুরুত্ব ছিল। কারণ আগেই জানানো হয়েছিল, যে দল ফেডারেশন কাপ জিতবে সেই দলই এশিয়ান ক্লাব ফুটবল চ্যাম্পিয়ানশিপে অংশ নিতে পারবে। কলকাতায় ফুটবলের দলবদলের সময় কথাটা মাথায় ছিল ইস্টবেঙ্গল-কর্মকর্তাদের। বিরাট অর্থ ব্যয় করে তাঁরা টিম করেছিলেন ফেডারেশন কাপে ভাল ফল করার চেষ্টায়। কোচ হিসেবে মোহনবাগান থেকে আনা হয়েছিল পি· কে· ব্যানার্জিকে। গোটা ব্যাপারটা ঠিক-ঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে য্যাওয়ায় ফেডারেশন কাপে জয়লাভ করে ইস্টবেঙ্গল। প্রথম এককভাবে ভারতের চ্যাম্পিয়ান ক্লাব হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার চেয়েও, প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে এশিয়ান ক্লাব কাপে খেলতে যাবার গৌরব ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের বেশি খুশি করেছিল।

কোচ পি কে

কিন্তু তারপর থেকেই শুরু হল নানারকম ঝামেলা। কলম্বোতে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে শ্রীলঙ্কা থেকে টুর্নামেন্ট সরিয়ে নেবার দাবি উঠল। তবে শেষ পর্যন্ত অবশ্য ঠিক হয়েছে টুর্নামেন্ট কলম্বোতেই হবে, চলবে ১-১৪ আগস্ট। এই গ্রুপে ভারতের চ্যাম্পিয়ান ক্লাব ইস্টবেঙ্গলকে খেলতে হবে শ্রীলঙ্কা, নেপাল, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের সেরা ক্লাবগুলির সঙ্গে। ইস্টবেঙ্গলের প্রথম খেলা ২ আগস্ট নেপাল চ্যাম্পিয়ান ক্লাবের বিরুদ্ধে। এর পরে তারা খেলবে পাঁচ, সাত, দশ, চোদ্দ তারিখে যথাক্রমে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। সব ম্যাচই হবে একসঙ্গে দিন এবং রাতের আলোয়। গ্রুপের চ্যাম্পিয়ানদের নিয়ে ফাইনাল পর্যায়ের খেলা শুরু হবে ১-১২ অক্টোবর।

এ দিকে সমস্যা দেখা দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবেও। কোচ পি· কে· এবং বিশিষ্ট কর্মকর্তারা চাইছেন ক্লাবের পঁচিশ জন খেলোয়াড়কেই দলের সঙ্গে পাঠানো হোক। এতে টিম স্পিরিট বজায় থাকবে। কিন্তু বাড়তি ৭ জনকে দলের সঙ্গে নিয়ে যেতে হলে বিমান ভাড়াই লাগবে ৫৩ হাজার টাকা। তার ওপর ওখানে দৈনিক থাকা-খাওয়ার খরচ লাগবে মাথাপিছু সাড়ে-ছশো টাকা। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ক্লাবের বাড়তি খরচ হবে এক লাখ টাকা।

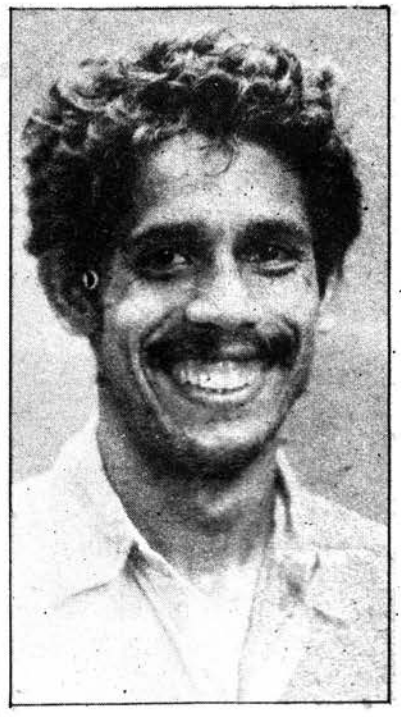

অধিনায়ক বলাই

কিন্তু 'হুট' বললেই তো টাকা পাওয়া যায় না। তাছাড়া এই মুহূর্তে এই বিরাট টাকার ঝুঁকি নেবার মতো ক্ষমতাও ক্লাবের নেই। ক্লাব-কর্তারা শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আবেদন রেখেছেন ক্লাবের সম্মানের কথা ভেবে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার। টাকা না পাওয়া গেলে হয়তো দু-তিন জন খেলোয়াড়ের ঘাড়ে কোপ পড়বে। কর্মকর্তা পাঠানো নিয়েও মুশকিল বেধেছে। সংগঠকরা তিন কর্মকর্তার থাকা-খাওয়ার খরচা দেবেন। তিন জনের একজন অবশ্যই কোচ পি· কে· ব্যানার্জি। দ্বিতীয় জন যদি সহকারী কোচ শ্যাম থাপা হন তাহলে তৃতীয় জন কে যাবেন এই নিয়েও চিন্তা বাড়ছে।

সংগঠকরা কিন্তু থেমে নেই। তাঁরা ইতিমধ্যেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কাছে জানতে চেয়েছেন কী ধরনের খাবার তাঁরা পছন্দ করেন? কী কী দ্রষ্টব্য স্থান দেখতে চান? সেইসঙ্গে পাঠাতে বলেছেন ক্লাবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, খেলোয়াড়দের পরিচিতি, জার্সি ও পতাকার রঙ ইত্যাদি। ওখানে তিনটি নাগরিক সম্বর্ধনাও দেওয়া হবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে।

ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের ট্র্যাক-স্যুট, ব্লেজার, শর্টস, বুট, মোজা, জামা, ট্রাউজার্স, পি· টি· শু দিচ্ছে বাটা ইণ্ডিয়া। তবে সমস্যা যাই-ই থাক, আপাতত ঠিক আছে ইস্টবেঙ্গল রওনা হচ্ছে ৩০ জুলাই।

বুস্ট

সারাদিন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলার জন্য সুস্বাদু শক্তিদায়ী পানীয়

আপনার সন্তানটি আজকের এই ধাবমান অগ্রগতির যুগের এক বাড়ন্ত সন্তান।

আজকের এই জটিল ইলেক্ট্রনিক যুগের সব খেলাই তার জীবনে এক চ্যালেঞ্জ। তার আগ্রহী এবং কৌতুহলী মন এই জটিলতাকে জানবার জন্য সে অনেক বেশী পড়াশুনো করে, অনেক বেশী পরিশ্রম করে-আনন্দ পায়। স্কুলে, টেনিস কোর্টে অথবা যে কোন নতুন খেলাতেই সে পরিশ্রম করতে আগ্রহী কারণ সে সর্বত্রই সর্বাগ্রে থাকতে চায়।

সত্যিই, আপনার সন্তানের আজ এক ক্ষিপ্র, গতিশীল জীবন, এক তীব্রগামী ট্রেনের মতই দুর্বার গতিতে তার দিনগুলি এগিয়ে চলেছে।

বুস্ট – এক চকলেটের স্বাদে সুস্বাদু শক্তিদাতা

এই স্ফূর্তি ভরা প্রাণচঞ্চল কর্মকাণ্ডে আপনার সন্তানের প্রচুর শক্তি ক্ষয় হচ্ছে। সুতরাং তার দিনগুলি এক নির্ভরযোগ্য শক্তিদায়ী পানীয় দিয়ে শুরু করাই সর্বোত্তম উপায়।

বুস্ট, ঘন দুধ, সোনালী দানার গম, মল্টেড বার্লি এবং কোকোর মতন শক্তিবর্দ্ধক উপাদানে তৈরী একটি সুস্বাদু পানীয়।

বুস্ট দুধে মিশিয়ে খেতে চমৎকার। সারাদিনের এই প্রাণচঞ্চল কর্মকাণ্ডের জন্য সজীব ও প্রাণবন্ত রাখতে সকালের জল খাবারের সঙ্গে বুস্ট একটি আদর্শ পানীয়।

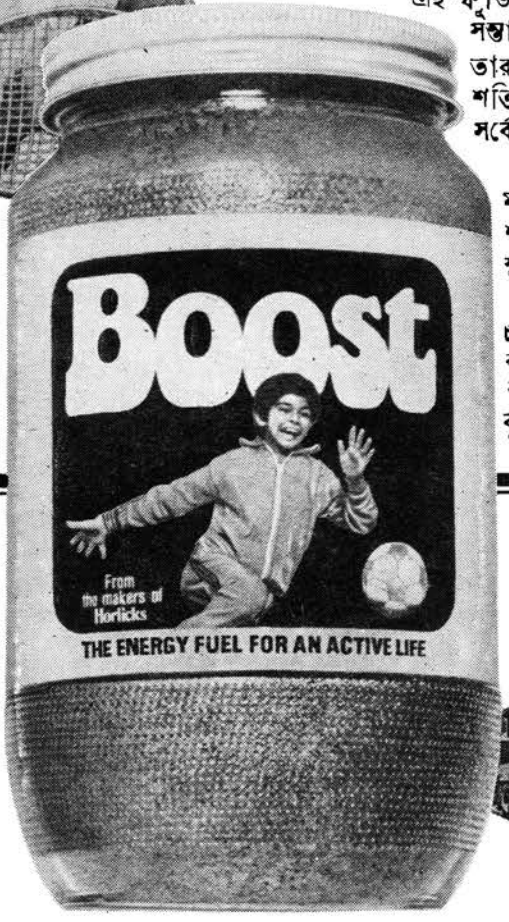

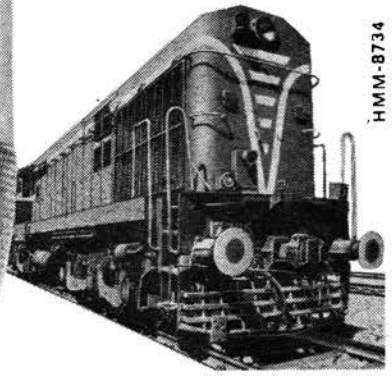

HMM-8734

বুস্ট

প্রাণচঞ্চল জীবনের জন্য অফুরান শক্তির রসদ

ANANDAMELA 24 JULY, 1985. Regd. No. WB/CC/264. MH-By-SOUTH 683TN/MS(C) 731

দেখতে খারাপ?

মাখতে ভালো!

মহান নিম

পুরাণে বলে, একদা পৃথিবীতে উপছে পড়েছিল কয়েক ফোঁটা অমৃত। জন্ম হ'ল নিমগাছের, তার শাখাপ্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ল মহৎ ওষধির গুণ।

আধুনিক গবেষণা বলে, নিমের শক্তি সবচেয়ে বেশি ক'রে আছে নিমের বীজ থেকে পাওয়া গাঢ়, ঘন নিমতেলের মধ্যে।

মার্গো ভারতবর্ষের আদি নিম সাবান। এর মধ্যে নিম তেলের পরিমাণ আর সব সাবানের চেয়ে অনেক বেশি। তাই, আজকের দূষিত আবহাওয়ার বিরুদ্ধে মার্গোর সযত্ন প্রহরা আপনার একান্ত প্রয়োজন।

শুদ্ধ মার্গো

মার্গোর প্রতিষেধক ক্ষমতা রোমকূপের গভীরে প্রবেশ করে, বের ক'রে আনে সমস্ত লুকোন ধুলোময়লা ও বীজাণু। ত্বক হয়ে ওঠে সুস্থ সুন্দর।

সজীব মার্গো

মার্গোর যত্নে অত্যধিক তেলতেলে ভাব কেটে গিয়ে ত্বকে আসে এক ঝরঝরে সজীবতা।

উজ্জ্বল মার্গো

স্নানের সময় শরীরের প্রয়োজনীয় তেলটুকু ফিরিয়ে দেয় মার্গো—ত্বক হয়ে ওঠে উজ্জ্বল, ভ'রে ওঠে স্বাভাবিক লাবণ্যে।

মার্গোয় ঘন নরম ফেনার প্রাচুর্য। তবু খুব ধীরে ক্ষয় হয় মার্গো। তাই অনেক দিন অবধি মার্গো আপনার স্নিগ্ধ সজীব স্নানের সঙ্গী।

60 YEARS IN SKIN CARE
60
NOW SOLD IN USA

মার্গোর গাঢ় নিমতেলের প্রাচুর্যে আপনার সারা দেহ হোক উদ্ভাসিত।

Response